(non-commercial use only. Redistribute only as it is.)

জ্ঞানতত্ত্ব ও ইসলাম

নূর হোসেন মজিদী

AwliyaLink
- For the Seekers of Truth !!!
www.ahlulbaytbanglabooks.wordpress.com
E-mail: awliya1214@gmail.com

জ্ঞানতত্ত্ব ও ইসলাম

নূর হোসেন মজিদী

AwliyaLink
- For the Seekers of Truth !!!
www.ahlulbaytbanglabooks.wordpress.com
E-mail: awliya1214@gmail.com

সূচীপত্র

ভূমিকা

জ্ঞানতত্ত্বের ওপর এক নযর

জ্ঞান অর্জন সম্ভব কি?

কিছু কিছু অকাট্য জ্ঞান অর্জন করা সম্ভব

জ্ঞানের স্তরভেদ

জ্ঞানের বিভিন্ন প্রকরণ

মাধ্যমবিহীন ও মাধ্যমনির্ভর জ্ঞান

উৎসভিত্তিক বিভাগ

প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য ভিত্তিক বিভাগ

প্রত্যক্ষ জ্ঞান

মাধ্যম যখন বিষয়বস্তু

স্বতঃপ্রকাশিত ও তাত্ত্বিক জ্ঞান

জ্ঞানের মাধ্যমভিত্তিক প্রকরণ ঃ

সহজাত জ্ঞান

ইন্দ্রিয়লব্ধ জ্ঞান

বিচারবুদ্ধিজাত জ্ঞান

অন্তঃকরণে উদ্ভূত জ্ঞান

বর্ণনাসূত্রে প্রাপ্ত জ্ঞান

অন্ধভাবে গ্রহণীয় জ্ঞান

কোরআন মজীদের দৃষ্টিতে জ্ঞানমাধ্যম

সহজাত জ্ঞান ঃ

ইন্দ্রিয়নিচয় ঃ

বিচারবুদ্ধি ঃ

অন্তঃকরণ ঃ

অন্তঃকরণের ইন্দ্রিয়নিচয় ঃ

জ্ঞানের পথে প্রতিবন্ধকতা

জ্ঞানমাধ্যম ও জ্ঞানসূত্রের গ্রহণযোগ্যতার ক্রমবিন্যাশ

বিচারবুদ্ধি ও ইসলাম

ইসলামী জ্ঞানচর্চায় বিচারবুদ্ধির প্রয়োগক্ষেত্র

সহায়ক সূত্র ঃ

AwliyaLink
- For the Seekers of Truth !!!
www.ahlulbaytbanglabooks.wordpress.com
E-mail: awliya1214@gmail.com

ভূমিকা

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

জ্ঞানতত্ত্ব (Epistemology – علم المعرفة/ نظرة المعرفة/ شناخت شناسى) হচ্ছে এমন একটি মানবিক বিজ্ঞান যা স্বয়ং ‘জ্ঞান’ নিয়ে চর্চা করে। অর্থাৎ জ্ঞান বলতে কী বুঝায়, জ্ঞানের বিভিন্ন প্রকরণ, জ্ঞানের উৎসসমূহ, জ্ঞান আহরণের মাধ্যমসমূহ ও তার নির্ভরযোগ্যতা যাচাই, সঠিক জ্ঞানের পথে প্রতিবন্ধকতাসমূহ ও তা দূরীকরণের পন্থা ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করে।

প্রশ্ন হচ্ছে, ইসলামের সাথে জ্ঞানতত্ত্বের সম্পর্ক কী?

ইসলাম হচ্ছে জ্ঞানের ধর্ম; বরং একমাত্র ইসলামই জ্ঞানের ধর্ম। কোরআন মজীদের সর্বপ্রথম নাযিলকৃত আয়াতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে ঃ اِقْرَاْ – “পড়ো।” অর্থাৎ আল্লাহ্ তা‘আলা মানুষের কাছ থেকে সর্বপ্রথম যা দাবী করলেন তা হচ্ছে, মানুষ পড়বে – জ্ঞান অর্জন করবে। কিন্তু এ জ্ঞান হতে হবে নির্ভুল জ্ঞান। কারণ, জ্ঞানে যদি বড় ধরনের ভুল থাকে তাহলে সে জ্ঞান অজ্ঞতা বা অজ্ঞানতার চেয়েও অধিকতর অবাঞ্ছিত এবং সে জ্ঞান কল্যাণের চেয়ে অকল্যাণই বেশী নিয়ে আসে।

বস্তুতঃ ভ্রান্ত ও ত্রুটিপূর্ণ জ্ঞান মানুষকে এমনভাবে বিপথে নিয়ে যেতে পারে যে, তার পক্ষে পরে আর কখনো সঠিক পথে ফিরে আসার সুযোগ ও সম্ভাবনা না-ও থাকতে পারে। এ বিষয়টি কোরআন মজীদেও সুস্পষ্ট ভাষায় উল্লেখ করা হয়েছে।

এরশাদ হয়েছে ঃ

□□□□□□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□ □□□□□□□□

□□□□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□

. □□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□ □ □□□□□□ □□□□□□□□□□□

"(হে রাসূল!) তাহলে আপনি কি তাকে দেখেছেন যে ব্যক্তি তার প্রবৃত্তিকে স্বীয় ইলাহ্‌রূপে গ্রহণ করেছে এবং আল্লাহ্‌ জ্ঞানের ওপরে তাকে পথভ্রষ্ট করেছেন, আর তার (অন্তরের) শ্রবণশক্তি ও ক্বাল্‌বের ওপর মোহর মেরে দিয়েছেন, আর তার (অন্তরের) দর্শনশক্তির ওপর আবরণ তৈরী করে দিয়েছেন? অতঃপর আল্লাহ্‌র পরে আর কে তাকে পথ দেখাবে? অতঃপর তোমরা কি (এ থেকে) শিক্ষা গ্রহণ করবে না?" (সূরাহ্‌ আল্‌-জাছিয়াহ্‌ ঃ ২৩)

এভাবে জ্ঞান যাদের পথভ্রষ্টতার কারণ তাদের কতকের পরিচয় আল্লাহ্‌ তা'আলা পরবর্তী আয়াতেই পেশ করেছেন। আল্লাহ্‌ তা'আলা এরশাদ করেন ঃ

□□□□□□□□□□ □□□ □□□□ □□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□

□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□ □ □□□□□

.□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□ □ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□□□□

"আর তারা বলে ঃ আমাদের এ পার্থিব জীবন ছাড়া আর কী আছে? আমরা মৃত্যুবরণ করি, আর জীবিত থাকি এবং মহাকাল ব্যতীত কোনো কিছু আমাদেরকে ধ্বংস করে না। (আসলে এ ব্যাপারে) তাদের (প্রকৃত) জ্ঞান নেই; তারা তো কেবল ধারণা-বিশ্বাস পোষণ করে মাত্র।" (সূরাহ্‌ আল্‌-জাছিয়াহ্‌ ঃ ২৪)

এ যুগেও অনেক তথাকথিত জ্ঞানী ও দার্শনিক এ ধরনের মত পোষণ করেন। বলা বাহুল্য যে, তাঁদের এ সব মতামত অকাট্য জ্ঞান ভিত্তিক নয়, বরং এগুলো তাঁদের ধারণা বা বিশ্বাস মাত্র। অতএব, কোনো জ্ঞান নির্ভুল ও অকাট্য কিনা তা পরীক্ষা-নিরীক্ষা

করে দেখা একটি অপরিহার্য প্রয়োজন। জ্ঞানতত্ত্ব এ প্রয়োজন পূরণে সহায়তা করে থাকে।

অবশ্য কেউ হয়তো বলতে পারেন যে, নির্ভুল জ্ঞান ও পথনির্দেশের জন্য আল্লাহ্ তা'আলার কিতাব কোরআন মজীদের দ্বারস্থ হওয়াই যথেষ্ট, অতঃপর আর জ্ঞানতত্ত্বের সাহায্য গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা থাকে না।

তিনটি কারণে এ যুক্তি অর্থাৎ জ্ঞানতত্ত্বের মুখাপেক্ষিতা প্রয়োজন না হওয়ার যুক্তি গ্রহণযোগ্য নয়। প্রথমতঃ জন্মসূত্রে যারা মুসলমান আল্লাহ্ তা'আলা কোরআন মজীদকে কেবল তাদের হেদায়াতের জন্যই নাযিল করেন নি। (বস্তুতঃ যখন কোরআন মজীদ নাযিল শুরু হয় তখন এবং তার পরেও বহু বছর যাবত কোনো জন্মসূত্রে মুসলমান ছিলো না।) বরং সমস্ত মানুষের সামনে উপস্থাপন ও গ্রহণের জন্য তাদের প্রতি আহ্বান জানানোর লক্ষ্যেই কোরআন মজীদ নাযিল করা হয়েছে। অতএব, যাদের সামনে কোরআন মজীদের দাও'আত পেশ করা হবে তাদের ভ্রান্ত ও ত্রুটিপূর্ণ জ্ঞানের ভ্রান্তি ও ত্রুটি চিহ্নিত ও খ-ন করার যোগ্যতা অর্জন করা মুসলমানদের জন্য, বিশেষ করে ওলামায়ে কেরাম ও ইসলামী জ্ঞানগবেষকদের জন্য অপরিহার্য।

দ্বিতীয়তঃ জ্ঞান-বিজ্ঞান ও দার্শনিকতার নামে এমন বহু বিভ্রান্তিকর ধারণার অস্তিত্ব রয়েছে যার মুখোমুখি হলে খুব কম লোকের পক্ষেই তুখোড় অপযুক্তির বেড়াজাল ছিন্ন করে সে সবের ভ্রান্তি বুঝতে পারা সম্ভব হয়। ফলে অনেকে, এমনকি কোরআন মজীদকে একনিষ্ঠভাবে আঁকড়ে ধরেছিলো এমন অনেক লোকও পথভ্রষ্ট হয়ে যায়। এভাবে অনেকের ঈমান হুমকির সম্মুখীন হয়।

তৃতীয়তঃ কোরআন মজীদের তাৎপর্য গ্রহণের ক্ষেত্রে বহু বিষয়ে মতপার্থক্য দেখা যায় এবং ক্ষেত্রবিশেষে এ মতপার্থক্য অত্যন্ত গুরুতর হয়ে থাকে। উদাহরণস্বরূপ, নবী-রাসূলগণ ('আঃ)-এর পক্ষে পাপকাজ সম্পাদন করা সম্ভব কিনা এ ব্যাপারে মতপার্থক্য

রয়েছে এবং এ মতপার্থক্যের উৎস কোরআন মজীদের এতদসংশ্লিষ্ট আয়াত সমূহের তাৎপর্য গ্রহণে মতপার্থক্য। আর শেষোক্ত ক্ষেত্রে মতপার্থক্যের জন্য যে সব কারণ দায়ী তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে জ্ঞানের সঠিক সংজ্ঞা এবং সঠিক জ্ঞান ও ভুল জ্ঞান চিহ্নিত করার মানদ-ের সাথে অনেকেরই পরিচয় না থাকা। এ পরিচয় অর্জনে সহায়তা করাই জ্ঞানতত্ত্বের কাজ।

শুধু ওলামায়ে কেরাম ও ইসলামী চিন্তাবিদগণই নন, যে কোনো শাস্ত্রের জ্ঞানচর্চাকারীদের জন্য পূর্বপ্রস্তুতি (مقدمات) হিসেবে মানবিক বিজ্ঞানের কয়েকটি শাখার সাথে ভালোভাবে পরিচয় থাকা প্রয়োজন বলে মনে করি। সেগুলো হচ্ছে ঃ যুক্তিবিজ্ঞান, জ্ঞানতত্ত্ব, দর্শন ও তাৎপর্যবিজ্ঞান এবং সেই সাথে যে ভাষার তথ্যসূত্রাদি ব্যবহার করা হবে (উৎস ভাষা – source language – زبان مبدء) ও যে ভাষায় লেখা হবে (লক্ষ্য ভাষা – target language – زبان مقصد) তার ওপরে ব্যাকরণের ব্যাপক ও গভীর জ্ঞান সহ দক্ষতা।

বক্ষ্যমাণ পুস্তকটি মূলতঃ জ্ঞানতত্ত্ব সম্বন্ধে অত্যন্ত সংক্ষেপে কিছুটা ধারণা দেয়ার লক্ষ্য একটি ছোট বৈঠকের জন্য প্রবন্ধ আকারে লেখা হয়েছিলো। পরে এটি অধিকতর সংক্ষিপ্ত আকারে সাপ্তাহিক রোববার-এ প্রকাশিত হয়েছিলো। এরপর কয়েক বছর আগে (২০১০-এর শেষার্ধে) একটি লেখক-সাংবাদিক প্রশিক্ষণ কোর্সের ক্লাস নিতে গিয়ে সেখানকার শিক্ষার্থীদের এ বিষয়ে কিছুটা ধারণা দেয়ার লক্ষ্যে অনেক দিন আগেকার এ প্রবন্ধটি খুঁজে বের করি এবং কম্পিউটারে কম্পোজ করে ফেলার সিদ্ধান্ত নেই। কম্পোজ করতে গিয়ে এটিকে কিছুটা পরিমার্জন ও সামান্য সম্প্রসারণ করেছি।

জ্ঞানতত্ত্ব সম্বন্ধে যথেষ্ট জানার আছে এবং লেখক, সাংবাদিক ও জ্ঞানগবেষকদের জন্য এ বিষয়ে বিস্তারিত অধ্যয়নের প্রয়োজন রয়েছে বলে মনে করি। এ পুস্তকে এ বিষয়ে ন্যূনতম ধারণা দেয়া

হয়েছে মাত্র। আশা করি এ পুস্তক পাঠক-পাঠিকাদের মধ্যে এ বিষয়ে অধিকতর অধ্যয়নের আগ্রহ সৃষ্টি করতে সক্ষম হবে। আর তাহলেই অত্র পুস্তকের সফলতা।

পুস্তকটির কম্পোজকৃত কপির সংশোধন ও পরিমার্জনের কাজ ২০১১ সালের জানুয়ারী মাসে করা হলেও এটি প্রকাশের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা সম্ভব হয় নি। এমতাবস্থায় এটিকে এ বিষয়ে আগ্রহী ফেসবুকের পাঠক-পাঠিকাদের ব্যবহারের জন্য ইউনিকোডে রূপান্তর ও প্রয়োজনীয় সংশোধনী সহ ধারাবাহিক নোট আকারে প্রকাশের পদক্ষেপ গ্রহণ করি। একই সাথে এর মূল পাণ্ডুলিপিতেও ছোটখাট যে সব ভুল ছিলো সেগুলো সংশোধন করি।

গ্রন্থটি থেকে যদি পাঠক-পাঠিকাদের মধ্যকার একজনও উপকৃত হন তাহলেই লেখকের পরিশ্রম সার্থক হবে। যদিও জ্ঞানতত্ত্বের সাথে পরিচিতি সকল ধরনের জ্ঞান-বিজ্ঞানের গবেষকের জন্যই অপরিহার্য, তবে ইসলামী জ্ঞানচর্চাকারীদের জন্য অনেক বেশী অপরিহার্য এবং কেবল এ কারণেই অত্র বিষয়ে লিখতে উদ্যোগী হয়েছিলাম। তাই আল্লাহ্ তা‘আলার কাছে প্রার্থনা, তিনি অত্র গ্রন্থ থেকে এর সকল পাঠক-পাঠিকাকে উপকৃত হবার তাওফীক্ব দিন এবং এটিকে এর লেখক, পাঠক-পাঠিকা এবং প্রচার-প্রসারে সহায়তাকারী সকলের পরকালীন নাজাতের জন্য সহায়ক হিসেবে কবূল্ করে নিন। আমীন।

বিনীত

নূর হোসেন মজিদী

ঢাকা

৮ই রাবী‘উল্ আউয়াল ১৪৩৬

১৭ই পৌষ ১৪২১

৩১শে ডিসেম্বর ২০১৪।

জ্ঞানতত্ত্বের ওপর এক নযর

জ্ঞান অর্জন সম্ভব কি?

জ্ঞানতত্ত্বের প্রথম আলোচ্য বিষয় হচ্ছে জ্ঞান অর্জন করা সম্ভব কিনা। এ প্রসঙ্গে এক বাক্যে জ্ঞানের সংজ্ঞা উল্লেখ করা যেতে পারে ঃ জ্ঞান হচ্ছে যে কোনো বস্তুগত ও অবস্তুগত অস্তিত্ব, ঘটনা, সম্পর্ক ও তাৎপর্য সম্বন্ধে এমন মনোলোকীয় রূপ যা হুবহু প্রকৃত অবস্থার প্রতিনিধিত্বকারী হবে। অর্থাৎ মানবমস্তিষ্কের ধারণক্ষমতার আওতায় কোনো কিছুর সঠিক প্রতিনিধিত্বকারী অবস্তুগত রূপই হচ্ছে সে সম্পর্কে মানুষের জ্ঞান।

কিন্তু সুপ্রাচীন কাল থেকেই এ প্রশ্ন ছিলো এবং এখনো আছে যে, কোনো কিছু সম্পর্কে সত্যকে জানা তথা সত্যিকারের জ্ঞান অর্জন করা আদৌ সম্ভব কিনা? এখনো অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে অনেককেই বলতে শোনা যায় ঃ যখন যার কথা শুনি তখন তা-ই সত্য বলে মনে হয়, সকলের কথায়ই যুক্তি আছে; আসলে কোন্‌টি সত্য তা কে জানে! হয়তো কোনোটিই সত্য নয়, হয়তো সত্যকে জানা আদৌ সম্ভব নয়।

এ জাতীয় বক্তব্য অনেক সময় দৃশ্যতঃ খুবই যুক্তিসিদ্ধভাবে উপস্থাপন করা হয়, ফলে অনেকের কাছে তা গ্রহণযোগ্য মনে হয় এবং তারা বিশ্বাস করতে শুরু করে যে, সত্যকে জানা যায় না।

এ ধরনের বিভ্রান্তিকর চিন্তা নতুন নয়। বরং যদ্দূর জানা যায়, প্রায় আড়াই হাজার বছর পূর্বে এ ধরনের চিন্তাধারার সূচনা হয়েছিলো। খৃস্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীতে গ্রীসে প্রোতাগোরাস (Protagoras) ও গর্জিয়াস (Gorigias) প্রমুখ একদল পণ্ডিত দাবী করেন যে, সত্য ও মিথ্যার কোনো অকাট্য মানদণ্ড নেই, বরং সত্য ও মিথ্যা ধারণা-কল্পনা মাত্র। প্রোতাগোরাস বলেন, প্রত্যেকেই নিজে যেমন বুঝেছে ঠিক সেভাবেই কোনো বিষয়ে মত ব্যক্ত করে, আর যেহেতু লোকদের বুঝ-সমঝ বিভিন্ন সেহেতু একই বিষয়ে তাদের মতামতও বিভিন্ন হয়ে থাকে। সুতরাং হতে পারে যে, একটি বিষয় সত্যও, আবার মিথ্যাও।

এ ধরনের চিন্তাধারা পোষণকারীরা যুক্তিতর্ক উপস্থাপনে খুবই সুদক্ষ ছিলেন এবং প্রতিপক্ষের লোকেরা সাধারণতঃ তাঁদের মতামত খণ্ডন করতে পারতেন না। তাই তাঁরা সমাজে জ্ঞানী (sophist) বলে পরিচিত হন। সক্রেটিস, প্লেটো ও এরিস্টোটল এদের বিভ্রান্তিকর মতাদর্শের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেন।

সক্রেটিসের যুগের পরবর্তীকালে সন্দেহবাদীদের উদ্ভব ঘটে। সফিস্ট ও সন্দেহবাদীদের চিন্তাধারার মধ্যে পার্থক্য এই যে, সফিস্টরা যেখানে সত্যকে ধারণা-কল্পনাভিত্তিক মনে করতেন অর্থাৎ পরস্পরবিরোধী ধারণাসমূহের সবগুলোকেই তথা প্রত্যেকের জন্য নিজ নিজ ধারণাকে সত্য বলে তথ্য সত্য-মিথ্যা নির্ণয়ের কোনো সর্বজনীন মানদণ্ড নেই বলে মনে করতেন, সেখানে সন্দেহবাদীদের অভিমত ছিলো এই যে, সত্যকে আদৌ জানা সম্ভব নয়। তাঁদের মতে, জ্ঞান আহরণের মাধ্যম পঞ্চেন্দ্রিয় ও বিচারবুদ্ধি (عقل – reason) উভয়ই ভুল তথ্য সরবরাহ করে, অতএব, প্রকৃত জ্ঞান অর্জন করা সম্ভব নয়। সন্দেহবাদী গ্রীক পণ্ডিত পির্‌হো (Pyrho) 'জ্ঞানার্জন সম্ভব নয়' – এ মতের সপক্ষে দশটি প্রমাণ উপস্থাপন করেন।

সন্দেহবাদীদের কথা হচ্ছে, ইন্দ্রিয় ও বিচারবুদ্ধি উভয় জ্ঞানমাধ্যমই ভুল করে। প্রতিটি ইন্দ্রিয়ই ভুল তথ্য সরবরাহ করে। পঞ্চেন্দ্রিয়ের মধ্যে সবচেয়ে বেশী তথ্য সরবরাহকারী ইন্দ্রিয় হচ্ছে চক্ষু, কিন্তু চক্ষু কয়েকশ' ধরনের ভুল করে থাকে। উদাহরণস্বরূপ, চক্ষু দূরের বড় জিনিসকে ছোট দেখতে পায়। অন্যান্য ইন্দ্রিয়ও ভুল করে, যেমন ঃ ত্বক। উদাহরণস্বরূপ, দু'টি উষ্ণ ও শীতল পানির পাত্রে দু'হাত ডুবিয়ে অতঃপর দু'য়ের মাঝামাঝি তাপমাত্রার পানির পাত্রে উভয় হাত ডুবালে এক হাতে গরম ও এক হাতে ঠা-া অনুভূত হবে, অথচ একই পানি, অতএব, তা একই সময় ঠা-া ও গরম দুইই হতে পারে না। আর বিচারবুদ্ধির ভুল আরো বেশী। তাঁরা বলেন, যে এক জায়গায় ভুল করেছে তার সব জায়গায়ই ভুল করার সম্ভাবনা অস্বীকার করা যায় না। অতএব, ইন্দ্রিয়নিচয় ও বিচারবুদ্ধি কোনোটির ওপরই আস্থা রাখা যায় না। সুতরাং সত্যে উপনীত হওয়া বা জ্ঞান অর্জন করা সম্ভব নয়।

তাঁরা আরো একটি যুক্তি উপস্থাপন করেছেন স্বপ্নের স্বরূপের দৃষ্টান্ত দিয়ে। তাঁরা বলেন, আমরা যখন স্বপ্ন দেখি তখন তাকে বাস্তব বলেই মনে করি। স্বপ্নে হাসি আছে, কান্না আছে, আনন্দ আছে, বেদনা আছে; রূপ, রস, বর্ণ, গন্ধ, স্বাদ তথা সব কিছুই আছে। স্বপলোকের সব কিছুই আমাদের কাছে বাস্তব বলে মনে হয়। কিন্তু ঘুম ভেঙ্গে গেলে আমরা বুঝতে পারি যে, তা স্বপ্ন ছিলো, বাস্তব ছিলো না। অতএব, আমরা যাকে বাস্তব বলি তা অর্থাৎ আমাদের এ জীবনও যে এক ধরনের স্বপ্ন নয় তার নিশ্চয়তা কোথায়? হয়তো এ-ও স্বপ্ন – মৃত্যুতে যার অবসান ঘটবে এবং আমরা প্রকৃত বাস্তবতায় ফিরে যাবো। অতএব, মোদ্দা কথা, সত্যকে জানা বা জ্ঞানার্জন করা সম্ভব নয়।

কিছু কিছু অকাট্য জ্ঞান অর্জন করা সম্ভব

ইন্দ্রিয়নিচয় ও বিচারবুদ্ধি যে ভুল করে থাকে তা অস্বীকার করার প্রয়োজন নেই। অতএব, এতদুভয়ের প্রদত্ত তথ্যের ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করা যেতেই পারে। আর কোনো কিছু সম্বন্ধে 'সন্দেহ' হওয়ার মানেই হচ্ছে তার যথার্থতা যেমন নিশ্চিত নয় তেমনি তার সঠিক হওয়াও অসম্ভব নয়। তাই তা চোখ বুঁজে গ্রহণ করা যেমন উচিত হবে না, ঠিক সেভাবেই তা চোখ বুঁজে প্রত্যাখ্যান করাও উচিত হবে না। বরং পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে তার ভ্রান্তিগুলো চিহ্নিত করা যেতে পারে। আর যতই ভ্রান্তি চিহ্নিত করা যাবে ততই সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হবার সম্ভাবনা বৃদ্ধি পাবে। এভাবে কতক বিষয়ে অবশ্যই অকাট্য জ্ঞানে উপনীত হওয়া সম্ভব হবে। ইমাম গাযযালী ও দেকার্তে (Descartes) সংশয় থেকে শুরু করে প্রত্যয়ে উপনীত হন এবং সংশয়বাদীদের মোকাবিলা করেন।

এ ব্যাপারে দেকার্তের যুক্তি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন, সকল বিষয়ে সংশয় পোষণ করতে পারি, কিন্তু সংশয় পোষণের ব্যাপারে তো আর সংশয় পোষণ করতে পারি না। তাহলে অন্ততঃ এই একটি বিষয়ে প্রত্যয় পোষণ করছি। আর যেহেতু আমি সংশয় পোষণ করি সেহেতু আমি আছি – এ ব্যাপারেও প্রত্যয় পোষণ করি। এছাড়া এমন কিছু বা এমন অনেক কিছু আছে যে ব্যাপারে আমি সংশয় পোষণ করছি। তাহলে এরূপ কিছু আছে যার স্বরূপ জানি না বলে সে সম্পর্কে সংশয় পোষণ করছি। তেমনি এ ব্যাপারেও প্রত্যয় পোষণ করি যে, ইন্দ্রিয়নিচয় ও বিচারবুদ্ধির অস্তিত্ব আছে এবং তারা ভুল করে থাকে। অতএব, এখানে আমরা কয়েকটি অস্তিত্বের ব্যাপারে সংশয়মুক্ত ও প্রত্যয়ের অধিকারী, সেগুলো হচ্ছে ঃ সংশয় নামক একটি অবস্থা, সংশয় পোষণকারী ব্যক্তি, যে বিষয় সম্পর্কে সংশয় পোষণ করা হয়, জ্ঞান আহরণের দু'টি মাধ্যম – ইন্দ্রিয়নিচয় ও বিচারবুদ্ধি এবং এতদুভয় ভুল করে থাকে। আর যেহেতু বিচারবুদ্ধি ভুল চিহ্নিত করতে সক্ষম এবং উক্ত বিষয়গুলোতে নির্ভুল সিদ্ধান্ত ও প্রত্যয়ে উপনীত হতে সক্ষম হয়েছে সেহেতু

বিচারবুদ্ধির পক্ষে ভুল চিহ্নিত করে অন্ততঃ কতক বিষয়ে নির্ভুল জ্ঞানে উপনীত হওয়া সম্ভব ।

আরেকটি যুক্তি সংশয়বাদীদের চিন্তা ও দর্শনের ভিত্তিকে পুরোপুরি ধ্বসিয়ে দিতে সক্ষম । তা হচ্ছে ঃ সমস্ত বিষয়ই সংশয়ের আবর্তে নিমজ্জিত – এ ধারণাকে যদি তারা নির্ভুল ও অকাট্য বলে প্রত্যয় পোষণ করে তাহলে এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, অন্ততঃ এই একটি ব্যাপারে তাদের সংশয় নেই । সে ক্ষেত্রে 'সব কিছুই' সংশয়ের আবর্তে নিমজ্জিত – এ দাবী ভুল প্রমাণিত হয়ে যায় । অর্থাৎ অন্ততঃ কিছু বিষয়ে সংশয়মুক্ত প্রত্যয় হাসিল করা যায় । আর 'সব কিছুই' সংশয়ের আবর্তে নিমজ্জিত – এ ধারণা সত্য হবার ব্যাপারেও যদি তাদের সংশয় থেকে থাকে তাহলে তাদের এ সংশয়ই তাদের তত্ত্বকে অগ্রহণযোগ্য করে দেয় । কারণ, যে তত্ত্বের সঠিক হবার ব্যাপারে সংশয় আছে তার ভিত্তিতে অন্য কোনো তথ্যের গ্রহণযোগ্যতা যাচাই ও সে সম্বন্ধে সংশয় পোষণ করা যেতে পারে না ।

জ্ঞানের স্তরভেদ

যে কোনো বিষয় (phenomena – پدیده) সম্বন্ধে বিভিন্ন ব্যক্তির জ্ঞান বিভিন্ন স্তরের হতে পারে । (এখানে আমরা ভুলজ্ঞান বা ভুলমিশ্রিত জ্ঞানকে আমাদের আলোচ্য বিষয়ের বাইরে রাখছি ।) কারো জ্ঞান হাল্কা ও অগভীর এবং কারো জ্ঞান গভীর হতে পারে । আবার কারো জ্ঞান সম্পূর্ণ ও কারো জ্ঞান অসম্পূর্ণ হতে পারে এবং অসম্পূর্ণ জ্ঞানের ক্ষেত্রেও অসম্পূর্ণতা বিভিন্ন পর্যায়ের হতে পারে । যেমন ঃ প্রথম বারের মতো কেউ যখন সকাল বেলা পূর্বাকাশে সূর্যকে উদয় হওয়ার অবস্থায় দেখতে পায় তখন সে তাকে একটি অস্তিত্ব হিসেবে বুঝতে পারে; তার এ জ্ঞান সত্য, তবে খুবই অগভীর, অসম্পূর্ণ ও প্রাথমিক স্তরের । কারণ, সে এটাকে একটা সোনালী চাকতি বলে মনে করতে পারে । সে ক্ষেত্রে এর পরিচয় বা স্বরূপ সম্বন্ধে তার ধারণা ভুল, কিন্তু এর অস্তিত্ব সম্বন্ধে তার ধারণা

সঠিক তথা জ্ঞানের পর্যায়ভুক্ত। পরে যদি সে বুঝতে পারে যে, এটি একটি আলোদানকারী অস্তিত্ব তাহলে সূর্য সম্বন্ধে তার জ্ঞান পূর্বাপেক্ষা শক্তিশালী ও উন্নততর স্তরের হলো। এভাবে সে এর আয়তন, অবস্থান, উপাদান, গঠনপ্রক্রিয়া, গতি, অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক আলোড়ন, এর অণু-পরমাণুগুলোর অবস্থান ও ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া ইত্যাদি সম্বন্ধে অবহিত হতে পারে।

জ্ঞানের আরেকটি স্তরগত ব্যবধান হচ্ছে স্বয়ং জ্ঞাত অস্তিত্বটি (বস্তুগত-অবস্তুগত নির্বিশেষে) যখন ব্যক্তির কাছে হাযির থাকে এবং যখন তা হাযির না থাকে শুধু সে সংক্রান্ত অবস্তুগত রূপ তার মস্তিষ্কে বিদ্যমান থাকে। যেমন ঃ সূর্য সামনে অর্থাৎ আকাশে থাকাকালে সূর্য সংক্রান্ত জ্ঞান এবং সূর্য আকাশে অনুপস্থিত থাকাকালে মস্তিষ্কে বিদ্যমান সে সংক্রান্ত ধারণা।

তেমনি আরেকটি স্তরগত ব্যবধান হচ্ছে, জ্ঞানের বিষয়টি জ্ঞানের অধিকারীর স্মৃতি বা অনুভূতিতে শক্তিশালী বা হাল্কাভাবে বা সুপ্তভাবে উপস্থিত থাকতে পারে। যেমন ঃ জ্ঞানের অধিকারীর কাছে তীব্র ক্ষুধার অবস্থায়, হাল্কা ক্ষুধার অবস্থায় ও ক্ষুধা না থাকা অবস্থায় ক্ষুধা সংক্রান্ত জ্ঞান। এটাকে জ্ঞানের শক্তি ও দুর্বলতার স্তরগত ব্যবধান বলা যেতে পারে।

জ্ঞানের আরেকটি স্তরগত বিভিন্নতা হচ্ছে এই যে, কোনো কোনো ক্ষেত্রে জ্ঞানের অধিকারী, জ্ঞান ও জ্ঞানের বিষয়বস্তু অভিন্ন, কোনো কোনো ক্ষেত্রে তা বিভিন্ন। ব্যক্তির নিজস্ব সত্তা এবং তার বিভিন্ন অবস্তুগত বৈশিষ্ট্য, যেমন ঃ ক্ষুধা, তৃষ্ণা, যৌনানুভূতি ইত্যাদি সংক্রান্ত জ্ঞান প্রকৃত পক্ষে তার নিজস্ব সত্তা থেকে বিচ্ছিন্ন কিছু নয়। অন্যদিকে তার বিভিন্ন ধারণা ও কল্পনা – প্রকৃত পক্ষে সে নিজেই যেগুলোর স্রষ্টা, সেগুলোর তার নিজ সত্তার বাইরে কোনো অস্তিত্ব নেই, কিন্তু তা তার সত্তার অপরিহার্য অংশ বা বৈশিষ্ট্যও নয়। অন্যদিকে তার সত্তার বাইরের বস্তুগত ও অবস্তুগত

জগতসমূহের বিভিন্ন অস্তিত্ব তার সত্তায় নিহিত নেই, কিন্তু সে সম্পর্কে তার জ্ঞান আছে।

তেমনি কারো জ্ঞান কোনো কিছুর সমগ্র সম্পর্কে হতে পারে, অথবা তার অংশবিশেষ সম্বন্ধে হতে পারে। কারো সামনে 'সমগ্র অস্তিত্বের' সকল সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম দিক, বৈশিষ্ট্য ও অবস্থা সহকারে সদাবিদ্যমানতা হচ্ছে জ্ঞানের সর্বোচ্চ স্তর এবং এ জ্ঞান কেবল আল্লাহ্ তা'আলারই রয়েছে।

জ্ঞানের বিভিন্ন প্রকরণ

জ্ঞানকে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বিভিন্ন প্রকরণে বিভক্ত করা যায়। বিভিন্ন দৃষ্টিকোণের ভিত্তিতে বিবেচনা করলে অনেক সময় কোনো জ্ঞান মাত্র একটি বিভাগে পড়ে এবং কোনো জ্ঞান একাধিক বিভাগে পড়তে পারে। জ্ঞানের বিভিন্ন ধরনের বিভাগের ক্ষেত্রে কতক বিভাগের নাম একাধিক ধরনের বিভাগে অভিন্ন এবং কতক নাম বিভিন্ন অর্থাৎ অভিন্ন নামের বিভাগের সংজ্ঞা বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে পৃথক হতে পারে।

মাধ্যমবিহীন ও মাধ্যমনির্ভর জ্ঞান

এ সব দৃষ্টিকোণের মধ্যে এক বিবেচনায় জ্ঞান দুই প্রকারের ঃ মাধ্যমবিহীন বা স্বতঃ জ্ঞান ও মাধ্যমনির্ভর জ্ঞান। জ্ঞানের অধিকারী কোনো কিছুর সাহায্য ছাড়াই, এমনকি স্বীয় ইন্দ্রিয়নিচয়ের সাহায্য ছাড়াই যে জ্ঞানের অধিকারী তা-ই মাধ্যমবিহীন বা স্বতঃ জ্ঞান। আর কোনো না কোনো মাধ্যমের সাহায্যে সে যে জ্ঞানের অধিকারী হয় তা মাধ্যমনির্ভর জ্ঞান। জ্ঞানের অধিকারীর স্বীয় অভ্যন্তরীণ সত্তা এবং তার সত্তার বিভিন্ন গুণ-বৈশিষ্ট্য ও অবস্থা, যেমন ঃ ক্ষুধা, তৃষ্ণা, আনন্দ, বিষাদ ইত্যাদি সম্বন্ধে তার জ্ঞান প্রথম পর্যায়ের। এ সব বিষয়ের জ্ঞান যে, মাধ্যমনির্ভর নয়, শুধু তা-ই নয়, বরং জ্ঞানের অধিকারী,

জ্ঞান ও জ্ঞানের বিষয়বস্তু অভিন্ন। তবে জ্ঞানের অধিকারীর শরীর ও এর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গসমূহ এ সব বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত নয়। কারণ, এ সবের জ্ঞানের অধিকারী হবার জন্য তাকে ইন্দ্রিয়ের সাহায্য নিতে হয়।

এক বিবেচনায় জ্ঞান তিন প্রকারের ঃ অনর্জিত (غير اكتسابى), অর্জিত (اكتسابى) ও বিচারবুদ্ধি কর্তৃক উৎপাদিত (توليدى عقلى) জ্ঞান। অনর্জিত জ্ঞান তা-ই যার অধিকারী হওয়ার জন্য তাকে কোনো রকমের ইন্দ্রিয়গত বা চৈন্তিক চেষ্টাসাধনা করতে হয় নি। এ ধরনের জ্ঞান দুই রকমের ঃ (১) স্বীয় সত্তা, স্বীয় সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্বের সত্যতা, স্বীয় ক্ষুধা-তৃষ্ণা ইত্যাদি সহজাত জ্ঞান (علم فطرى) এবং (২) অন্তরে উদ্ভূত জ্ঞান (علم قلبى) যেমন ঃ ওয়াহী ও ইল্‌হামের মাধ্যমে প্রাপ্ত জ্ঞান। অর্জিত জ্ঞানের মধ্যে রয়েছে ইন্দ্রিয়লব্ধ জ্ঞান ও পরীক্ষালব্ধ বা অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান। এছাড়া মানুষের বিচারবুদ্ধি (عقل) অন্যান্য জ্ঞান পর্যালোচনা করে বিভিন্ন ধরনের নতুন নতুন জ্ঞান উদ্ভাবন করে থাকে।

উৎসভিত্তিক বিভাগ

জ্ঞানবিভাগের দৃষ্টিকোণসমূহের মধ্যে একটি হচ্ছে উৎসভিত্তিক দৃষ্টিকোণ।

মানুষের জ্ঞানের দু'টি উৎস চিন্তা করা যায় ঃ অভ্যন্তরীণ উৎস ও বাইরের উৎস। অভ্যন্তরীণ উৎস মানে স্বয়ং তার সত্তা অর্থাৎ যে জ্ঞান তার সত্তায় নিহিত থাকে বা স্বয়ংক্রিয়ভাবে উদ্ভূত হয় সে জ্ঞানের উৎস হিসেবে প্রাথমিক পর্যায়ে স্বয়ং তার সত্তাকেই গণ্য করা যায়। 'প্রাথমিক পর্যায়ে' বলার উদ্দেশ্য এই যে, তার সত্তায় নিহিত জ্ঞান অন্য কোনো সত্তা থেকে নিহিত রাখা হয়ে থাকতে পারে বা উদ ভূত করা হয়ে থাকতে পারে ('থাকতে পারে' যুক্তির খাতিরে বলা হয়েছে, আসলে 'রাখা হয়েছে' ও 'উদ্ভূত করা হয়েছে')। অর্থাৎ দৃশ্যতঃ এ ধরনের জ্ঞান তার অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে উৎসারিত।

অন্য কথায়, সে বাহ্যিক তথ্যমাধ্যমের – যেমন ঃ ইন্দ্রিয়নিচয়ের – সাহায্য ছাড়াই এ জ্ঞানের অধিকারী হয়ে থাকে। এ ধরনের কোনো কোনো জ্ঞান জন্মের পর থেকে স্বতঃপ্রকাশিত হয় অর্থাৎ তার সত্তায় নিহিত থাকে, যেমন ঃ ক্ষুধা-তৃষ্ণার জ্ঞান। আবার কোনো জ্ঞান তার মধ্যে সম্ভাবনা আকারে সুপ্ত থাকে যা উপযুক্ত সময়ে ও পরিবেশে তার মধ্যে জাগ্রত হয়, যেমন ঃ যৌনক্ষুধার জ্ঞান। এছাড়া কোনো কোনো জ্ঞান সরাসরি তার মধ্যে অন্য কোনো অপার্থিব উৎস থেকে সঞ্চারিত হতে পারে, যেমন ঃ ওয়াহী, ইল্‌হাম, যথাযথ চিন্তা-গবেষণা ছাড়াই অন্তরে কোনো বৈজ্ঞানিক তথ্যের উদ্ভব ইত্যাদি।

ওপরে যে সব জ্ঞান-উৎসের কথা উল্লেখ করা হয়েছে তার বিপরীতে রয়েছে মানুষের নিজ সত্তার বাইরে অবস্থিত জ্ঞানসূত্রসমূহ; প্রাকৃতিক জগত সহ তার সত্তাবহির্ভূত যতো কিছু থেকে সে জ্ঞান লাভ করে তার সব কিছুই বাইরের জ্ঞানসূত্র।

প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য ভিত্তিক বিভাগ

জ্ঞানকে তার প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে দুই ভাগে ভাগ করা যেতে পারে ঃ উপস্থিত জ্ঞান বা প্রত্যক্ষ জ্ঞান (علم حضوری) ও অর্জনীয় জ্ঞান (علم حصولی)। প্রত্যক্ষ জ্ঞান হচ্ছে তা-ই কোনো রকম মাধ্যম ছাড়াই যে জ্ঞান ব্যক্তির সত্তায় বিদ্যমান থাকে। প্রত্যক্ষ জ্ঞান কয়েক ধরনের হতে পারে ঃ (১) সত্তায় সরাসরি বিদ্যমান জ্ঞান, যেমন ঃ ব্যক্তির নিজের অস্তিত্ব সম্বন্ধে জ্ঞান, স্বীয় উৎস বা সৃষ্টিকর্তা সম্বন্ধে সাধারণ ধারণা রূপ জ্ঞান, ক্ষুধাতৃষ্ণা সংক্রান্ত জ্ঞান, যৌনক্ষুধার জ্ঞান ইত্যাদি – যাকে সহজাত জ্ঞান (علم فطری)ও বলা যেতে পারে। (২) ব্যক্তির ধারণা-কল্পনাজাত অবস্তুগত অস্তিত্ব সমূহ সংক্রান্ত জ্ঞান এবং (৩) ওয়াহী ও ইল্‌হাম জাতীয় জ্ঞান যা বাইরের অপার্থিব উৎস থেকে ব্যক্তির সত্তায় জাগ্রত হওয়ার পর স্থিতিলাভ করে।

অর্জনীয় জ্ঞান হচ্ছে ইন্দ্রিয়নিচয় ও অন্যান্য তথ্যমাধ্যম বা জ্ঞানমাধ্যমের সাহায্যে বাইরের উৎস থেকে অর্জিত জ্ঞান বা চিন্তা-গবেষণার মাধমে উদ্ঘাটিত জ্ঞান ।

অর্জনীয় জ্ঞান সংশ্লিষ্ট বিষয়বস্তুসমূহের সরাসরি প্রত্যক্ষণ বা সরাসরি অভিজ্ঞতা থেকে অর্জিত হতে পারে, অথবা লেখ্য ও কথনীয় ভাষা, ছবি, আকার-ইঙ্গিত ইত্যাদি প্রতীকের সাহায্যে হতে পারে ।

জ্ঞানকে ভিন্ন এক দৃষ্টিকোণ থেকে অন্যভাবেও ভাগ করা যেতে পারে । যেমন ঃ (১) সহজাত জ্ঞান (علم فطری), (২) প্রত্যক্ষ জ্ঞান (علم حضوری) ও (৩) অর্জনীয় জ্ঞান (علم حصولی) । এ ধরনের বিভাগে জ্ঞানের অধিকারীর সত্তা এবং তার বৈশিষ্ট্য ও অবস্থা সমূহ সংক্রান্ত জ্ঞানকে সহজাত জ্ঞান, এর বহির্ভূত বিষয়াদি সংক্রান্ত অনর্জিত জ্ঞান তথা অন্তঃকরণে উদ্ভূত জ্ঞানকে প্রত্যক্ষ জ্ঞান এবং ইন্দ্রিয়লব্ধ তথ্যাদিকে ও তা বিশ্লেষণের মাধ্যমে বিচারবুদ্ধি কর্তৃক গৃহীত উপসংহারকে 'অর্জনীয় জ্ঞান'-এর পর্যায়ে ফেলা হয় । তেমনি সহজাত জ্ঞানকেও অনেকে প্রত্যক্ষ জ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত করেন । এর কারণ, সহজাত জ্ঞানের বিষয়বস্তু ব্যক্তির সত্তার মধ্যে প্রকাশিত হবার পর সদা বিদ্যমান থাকে ।

প্রত্যক্ষ জ্ঞান

ইতিমধ্যেই যেমন আভাস দেয়া হয়েছে, প্রত্যক্ষ জ্ঞান (علم حضوری) হচ্ছে জ্ঞানের অধিকারী বা জ্ঞানী (عالم)-এর সত্তায় নিহিত অনর্জিত জ্ঞান এবং সে জ্ঞানের বিষয়বস্তু বা জ্ঞাত বিষয় (معلوم) হচ্ছে স্বয়ং সেই সত্তা এবং তার বৈশিষ্ট্য ও অবস্থা সমূহ । অর্থাৎ এখানে জ্ঞানী, জ্ঞান ও জ্ঞাত অভিন্ন । বস্তুতঃ সমস্ত রকমের জ্ঞানের মধ্যে একমাত্র প্রত্যক্ষ জ্ঞানের যথার্থতা সম্বন্ধে যে কারো পক্ষেই শতকরা একশ' ভাগ নিশ্চিত হওয়া সম্ভব ।

এখানে জ্ঞানীর সত্তার বৈশিষ্ট্য ও অবস্থা সমূহ সম্পর্কে একটি প্রণিধানযোগ্য বিষয় হচ্ছে এই যে, বাইরে থেকে প্রাপ্ত বা অর্জিত জ্ঞানসমূহ এবং তার সত্তায় উৎপাদিত সকল প্রকার জ্ঞান (বিচারবুদ্ধির উদ্ভাবন ও ধারণা-কল্পনা নির্বিশেষে) যখন জ্ঞানীর সত্তায় স্থিতিলাভ করে তখন তা তার সত্তার সাথে অবিচ্ছেদ্য হয়ে যায় এবং জ্ঞানী অন্য কোনো মাধ্যম ব্যতীতই সে সম্পর্কে অবহিত থাকে। এ কারণে তা-ও প্রত্যক্ষ জ্ঞানের বিষয়বস্তুর অন্যতম হয়ে যায়। অর্থাৎ এ ধরনের জ্ঞানকে যখন লাভ করার পন্থা ও উৎসের ভিত্তিতে বিবেচনা করা হয় তখন তা প্রাপ্ত বা অর্জিত জ্ঞান, আর যখন বিদ্যমানতার ভিত্তিতে দেখা হয় তখন তা প্রত্যক্ষ জ্ঞান। অন্যদিকে জ্ঞানী যখন তার সত্তায় নিহিত এ জ্ঞানের সাহায্যে জ্ঞানের মূল বিষয়বস্তুর প্রতি মনোযোগ দেয় তখন তা প্রাপ্ত বা অর্জিত জ্ঞানের পর্যায়ভুক্ত হয়, আর যখন স্বয়ং জ্ঞানের দিকে মনোযোগ দেয় অর্থাৎ তার সত্তায় নিহিত ঐ সব বিষয়বস্তুর অবস্তুগত রূপের দিকে মনোযোগ দেয় তখন তা প্রত্যক্ষ জ্ঞান।

এ বিষয়টি সম্বন্ধে একটি চমৎকার উপমা দেয়া হয়েছে। তা হচ্ছে ঃ আমরা যখন একটি আয়নার দিকে এ উদ্দেশ্যে তাকাই যে, তার আকার-আকৃতি ও আয়তন এবং তার বৈশিষ্ট্যসমূহ প্রত্যক্ষ করবো অর্থাৎ তা পুরোপুরি ঠিকঠাক আছে কিনা, নাকি তাতে কোনো ত্রুটি আছে, আয়নাটির প্রতি এভাবে তাকানোর সাথে আয়নাটিতে চেহারা বা তাতে প্রতিফলিত অন্য কোনো দৃশ্য দেখার উদ্দেশ্যে তার দিকে তাকানোর পার্থক্য আছে। প্রথম ক্ষেত্রে আয়নাটিই লক্ষ্য এবং দ্বিতীয় ক্ষেত্রে আয়নাটি লক্ষ্য নয়, মাধ্যম মাত্র। অনুরূপভাবে জ্ঞানীর সত্তার বাইরের যে কোনো বিষয়বস্তু সম্পর্কে জ্ঞানীর জ্ঞান তার সত্তার অংশ হিসেবে প্রত্যক্ষ জ্ঞান অর্থাৎ তা নিজেই একটি অভ্যন্তরীণ বিষয় ও সত্তার সাথে অবিচ্ছেদ্য এবং বাইরের সেই বিষয়ের প্রতি মনোযোগের মাধ্যম হিসেবে তা অর্জিত জ্ঞান।

মাধ্যম যখন বিষয়বস্তু

ওপরের আলোচনা থেকে সুস্পষ্ট যে, অভিন্ন বিষয় অভিন্ন জ্ঞানীর জন্য কখনো জ্ঞানের মাধ্যম ও কখনো জ্ঞাত বিষয় হতে পারে। এ কথাটি জ্ঞানার্জনের জন্য ব্যবহৃত প্রতীক সম্বন্ধেও প্রযোজ্য। লেখ্য ও কথনীয় ভাষা, এতে ব্যবহৃত বিভিন্ন বর্ণ, চিহ্ন ও ধ্বনি এবং বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের চিত্র, চলচ্চিত্র, অঙ্গভঙ্গি ইত্যাদি এ সবের বাইরে অবস্থিত বিভিন্ন বস্তুগত ও অবস্তুগত বিষয়বস্তু সম্পর্কিত জ্ঞানের মাধ্যম হতে পারে, আবার স্বয়ং এগুলো সম্পর্কেও জ্ঞান অর্জন করা হতে পারে। প্রথম ক্ষেত্রে এ সব প্রতীক হচ্ছে জ্ঞানার্জনের মাধ্যম বা প্রতীক এবং দ্বিতীয়োক্ত ক্ষেত্রে আর এগুলো জ্ঞানার্জনের মাধ্যম বা প্রতীক নয়, বরং স্বয়ং জ্ঞানের বিষয়বস্তু বা 'জ্ঞাত'।

স্বতঃপ্রকাশিত ও তাত্ত্বিক জ্ঞান

আরেক দৃষ্টিকোণ থেকে জ্ঞানকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে ঃ (১) স্বতঃপ্রকাশিত জ্ঞান (علم بديهى) ও (২) তাত্ত্বিক জ্ঞান (علم نظرى)।

স্বতঃপ্রকাশিত জ্ঞান হচ্ছে এমন জ্ঞান যা মানুষের সত্তার কাছে নিজে নিজেই ধরা পড়ে এবং যা যুক্তিতর্ক ও দলীল দ্বারা প্রমাণের মুখাপেক্ষী নয়। যেমন ঃ অভিন্ন স্থান ও কালে একটি বস্তু আছে এবং নেই – এটা হওয়া অসম্ভব। তেমনি ঃ যে কোনো বস্তুর অস্তিত্ব প্রমাণ করে যে, তার অস্তিত্বদানকারী রয়েছে। অনুরূপভাবে, ব্যক্তির কাছে তার নিজের অস্তিত্বের সত্যতা কোনোরূপ প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না। স্বতঃপ্রকাশিত জ্ঞানের উপমা দিতে গিয়ে বলা হয় ঃ সূর্যের উদয়ই সূর্যের অস্তিত্বের প্রমাণ; এ জন্য অন্য কোনো প্রমাণের প্রয়োজন নেই।

তাত্ত্বিক জ্ঞান হচ্ছে তা-ই যা যুক্তিতর্ক, দলীল-প্রমাণ বা বাস্তব পরীক্ষা-নিরীক্ষা দ্বারা প্রমাণ করা অপরিহার্য।

তাত্ত্বিক জ্ঞান দুই ধরনের। এক ধরনের তাত্ত্বিক জ্ঞান হচ্ছে বস্তুধর্মের বহির্ভূত বিষয়াদির জ্ঞান অর্থাৎ অবস্তুগত জগতের ও মানবিক বিষয়াদির জ্ঞান – যার বিপরীতে রয়েছে বস্তুবিজ্ঞানের জ্ঞান। দর্শন, 'আক্বায়েদ, 'ইর্‌ফান্‌, সমাজতত্ত্ব, মনোবিজ্ঞান ইত্যাদি হচ্ছে প্রথম ধরনের তাত্ত্বিক জ্ঞান।

আর দ্বিতীয় ধরনের তাত্ত্বিক জ্ঞান হচ্ছে বস্তুধর্ম সম্পর্কে হাতেকলমে পরীক্ষা-নিরীক্ষা না করে কেবল অধ্যয়ন বা শ্রবণের মাধ্যমে অর্জিত জ্ঞান। এ শেষোক্ত ধরনের জ্ঞান সম্পর্কে কেবল পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমেই নিশ্চিত হওয়া সম্ভবপর। যেমন ঃ পানি ১০০ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় ফুটতে থাকে – এটি একটি তত্ত্ব যা পরীক্ষাগারে বাস্তব পরীক্ষা-নিরীক্ষার পরেই কেবল গ্রহণযোগ্যতা লাভ করে।

জ্ঞানের মাধ্যমভিত্তিক প্রকরণ ঃ

মানুষ যে সব মাধ্যমের বদৌলতে জ্ঞানের অধিকারী হয় সাধারণতঃ তার ভিত্তিতেই জ্ঞানের প্রকরণ নির্ধারণ করা হয়। আমরা এখন জ্ঞান আহরণের মাধ্যমসমূহ ও তার ভিত্তিতে জ্ঞানের প্রকরণসমূহের দিকে দৃষ্টি দেবো।

মানুষ চারটি মাধ্যম থেকে জ্ঞান লাভ করে এবং এর ভিত্তিতে জ্ঞানকে চার ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। এ চারটি জ্ঞানমাধ্যম হচ্ছে ঃ স্বভাব-প্রকৃতি (فطرة – ফিত্‌রাত্‌), ইন্দ্রিয়নিচয়, বিচারবুদ্ধি (عقل – 'আক্ব্‌ল্‌) ও অন্তঃকরণ (قلب – ক্বাল্‌ব্‌)। এ চার মাধ্যমে অর্জিত জ্ঞানকে যথাক্রমে স্বভাবজাত বা সহজাত জ্ঞান, ইন্দ্রিয়লব্ধ জ্ঞান, বিচারবুদ্ধিলব্ধ জ্ঞান ও অন্তঃকরণে উদ্ভূত জ্ঞান নামে অভিহিত করা যেতে পারে।

সহজাত জ্ঞান

সহজাত বা স্বভাবজাত জ্ঞান হচ্ছে ঐ সব জ্ঞান মানুষ জন্মগতভাবেই যার অধিকারী হয়। যেমন ঃ ক্ষুধা-তৃষ্ণার জ্ঞান, শারীরিক আরাম ও কষ্টের জ্ঞান ইত্যাদি। মানুষ ছাড়া অন্যান্য প্রাণীও সহজাত জ্ঞানের অধিকারী। বরং অন্যান্য প্রাণীর সহজাত জ্ঞানের আওতা মানুষের সহজাত জ্ঞানের আওতার চেয়ে ব্যাপকতর।

সহজাত জ্ঞান দুই ধরনের। এক ধরনের জ্ঞান ব্যক্তির সত্তায় কোনোরূপ মাধ্যম ছাড়াই জাগ্রত হয়। যেমন ঃ শরীরে খাদ্য-পানীয়ের প্রয়োজন হলেই ব্যক্তি নিজে নিজেই তা বুঝতে পারে। এ ধরনের জ্ঞানকে ভিন্ন এক বিবেচনায় প্রত্যক্ষ জ্ঞান (علم حضوری – 'ইল্‌মে হুযূরী)ও বলা যেতে পারে।

আরেক ধরনের জ্ঞান মানুষের সত্তায় সম্ভাবনা আকারে বিদ্যমান থাকে যা তার কাছে যথাসময়ে ও উপযুক্ত পরিবেশে প্রকাশ পায়। যেমন ঃ যৌনতার জ্ঞান – যা শিশুর মধ্যে সম্ভাবনা আকারে নিহিত থাকে এবং বয়সের একটি সুনির্দিষ্ট স্তর পার হবার পর নিজ থেকেই ক্রমান্বয়ে তার মধ্যে এ জ্ঞান জন্ম নেয়।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, যৌনতার জ্ঞান ও যৌন ক্ষুধার জ্ঞান এক পর্যায়ের নয়। যৌন ক্ষুধার জ্ঞান ক্ষুধা-তৃষ্ণার মতোই প্রত্যক্ষ জ্ঞান। কিন্তু যৌন ক্ষুধার বয়সে উপনীত হবার অব্যবহিত পূর্ববর্তী একটি ক্রান্তিকালে যৌনতা সম্বন্ধে নিজ থেকেই যে ধারণা ও জানার আগ্রহ গড়ে ওঠে তা এতদসংক্রান্ত সম্ভাবনার বিকাশ ছাড়া আর কিছুই নয়।

ইন্দ্রিয়লব্ধ জ্ঞান

চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক – এই পাঁচটি শারীরিক ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে যে জ্ঞান অর্জিত হয় তা-ই ইন্দ্রিয়লব্ধ জ্ঞান (علم

حسى – 'ইল্‌মে হিস্‌সী) বা অভিজ্ঞতাজাত ও পরীক্ষালব্ধ জ্ঞান (علم تجربى – 'ইল্‌মে তাজ্‌রাবী)।

এক হিসেবে ইন্দ্রিয়নিচয়কে জ্ঞানমাধ্যম না বলে স্রেফ তথ্যসংগ্রহ মাধ্যম বলাই অধিকতর সঠিক। কারণ, ইন্দ্রিয়নিচয় অসংখ্য তথ্য সংগ্রহ করে মাত্র; বিচারবুদ্ধিই এসব তথ্যকে সমন্বিত করে জ্ঞানে পরিণত করে। উদাহরণস্বরূপ, কোনো ব্যক্তির নাকে যখন সুগন্ধ অনুভূত হয় তখন তার নাকের স্নায়ুতন্ত্র তার মস্তিষ্কে এ তথ্যটি পাঠিয়ে দেয় এবং তার চোখ যখন একটি ফুল দেখতে পায় তখন চোখের স্বায়ুতন্ত্রী মস্তিষ্কে সে তথ্য পাঠিয়ে দেয়। এমতাবস্থায় তার বিচারবুদ্ধি এ দুই তথ্যের সমন্বয়ে গবেষণা করে এ উপসংহারে উপনীত হয় যে, ঐ ফুলটিই নাকে ভেসে আসা সুগন্ধির উৎস। এমনকি সে ঐ সময় চোখে ঐ ফুলটি দেখতে না পেলেও অতীত অভিজ্ঞতা থেকে মস্তিষ্কে সঞ্চিত তথ্যের সাথে বর্তমান তথ্য অর্থাৎ নাকের মাধ্যমে সংগৃহীত সর্বসাম্প্রতিক তথ্যকে মিলিয়ে নিয়ে বিচারবুদ্ধি উপসংহারে উপনীত হয় যে, আশেপাশে কোথাও অমুক ফুল রয়েছে এবং তা থেকেই এ সুঘ্রাণ আসছে।

বিচারবুদ্ধিজাত জ্ঞান

বিচারবুদ্ধি ('আক্বল্‌) হচ্ছে মানুষের বস্তুগত শরীরকে আশ্রয় করে অবস্থানরত একটি অবস্তুগত শক্তি। বিচারবুদ্ধি হচ্ছে স্বয়ং জ্ঞানের উৎস, অন্যান্য তথ্য-আহরণ মাধ্যম থেকে প্রাপ্ত তথ্যাদির পর্যালোচনা ও সমন্বয় করে সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী তথা জ্ঞানের উৎপাদনকারী এবং তথ্য-আহরণ মাধ্যম থেকে প্রাপ্ত তথ্যাদির ভুলত্রুটি নির্ণয়কারী।

বিচারবুদ্ধি স্বীয় অস্তিত্ব সম্বন্ধে নিজে নিজেই জ্ঞানের অধিকারী; এ জ্ঞানের জন্য সে অন্য কোনো তথ্য-আহরণ

মাধ্যমের দ্বারস্থ নয়। বিচারবুদ্ধি জ্ঞানের অস্তিত্বও অবগত – যা কোনো বস্তুগত বিষয় নয়।

বিচারবুদ্ধি এমন অনেক অকাট্য বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক তথ্য অবগত হতে পারে যা ইন্দ্রিয়নিচয়ের ধারণক্ষমতার বাইরে। যেমন ঃ বিচারবুদ্ধি এ বিশ্বজগতের অস্তিত্বের পিছনে একজন স্রষ্টার অস্তিত্ব সম্বন্ধে ধারণা করতে ও প্রত্যয়ে উপনীত হতে সক্ষম যদিও কোনো ইন্দ্রিয়েই স্রষ্টার অস্তিত্ব প্রতিফলিত হয় না (অর্থাৎ ব্যক্তি চোখ দ্বারা স্রষ্টাকে দেখে নি, কান দ্বারা স্রষ্টার কথা শোনে নি, হাত দ্বারা তাঁকে স্পর্শ করে নি, ...)। এছাড়া বিচারবুদ্ধি কোনো বস্তুর সাহায্য ছাড়াই সংখ্যার ধারণা করতে পারে, তেমনি মাত্রাহীন, একমাত্রিক ও দ্বিমাত্রিক অস্তিত্ব (যা অবস্তুগত অস্তিত্ব)[১] এবং অবস্তুগত ত্রিমাত্রিক অস্তিত্ব সম্বন্ধেও ধারণা করতে পারে। সে কল্পনা করতে পারে এবং কল্পনায় অনেক কিছু সৃষ্টি করতে পারে। তেমনি সে বস্তুগত সৃষ্টিতে রূপান্তর সাধনের পরিকল্পনা করতে পারে অর্থাৎ বাস্তবে রূপান্তর সাধনের পূর্বে সে কল্পনায় রপান্তর সাধনের কাজ করে থাকে। আর এ সবের কোনোটিই ইন্দ্রিয়লব্ধ জ্ঞান নয় যদিও এ সব ক্ষেত্রে সে ইন্দ্রিয়লব্ধ তথ্যাদি থেকে সাহায্য নিয়ে থাকতে পারে।

অতএব, বিচারবুদ্ধি হচ্ছে একটি স্বাধীন জ্ঞানমাধ্যম ও জ্ঞান-উৎস।

অনেকে (বস্তুবাদীরা) বিচারবুদ্ধির অস্তিত্ব অস্বীকার করার চেষ্টা করে এবং দাবী করে যে, যে সব কাজকে বিচারবুদ্ধির কাজ বলে দাবী করা হয় তা আসলে মস্তিষ্কের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া মাত্র। কিন্তু তাদের এ দাবী এ কারণে গ্রহণযোগ্য নয় যে, মস্তিষ্কের জ্ঞানকোষগুলো বস্তুগত উপাদানে তৈরী এবং তা প্রাপ্ত তথ্যাদি সঞ্চয় করে মাত্র; এ সব তথ্যের

---

1 যেমন ঃ জ্যামিতিক বিন্দু, রেখা ও ক্ষেত্র।

পর্যালোচনা, সমন্বয় সাধন, সংশোধন ও তা থেকে নতুন তথ্যে তথা উপসংহারে উপনীত হওয়ার জন্য অবশ্যই একটি স্বতন্ত্র হস্তক্ষেপকারী উপাদান অপরিহার্য। আর বস্তুজগতের বাইরের বিষয়ে তো নিজে নিজেই মস্তিষ্কে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া হবার প্রশ্নই ওঠে না। কারণ, এরূপ ক্ষেত্রে কোনোরূপ ইন্দ্রিয়লব্ধ তথ্যের প্রভাব থাকে না। অতএব, এ ক্ষেত্রে একটি অবস্তুগত শক্তির প্রভাব বা হস্তক্ষেপ অপরিহার্য। এ অবস্তুগত শক্তিই হচ্ছে বিচারবুদ্ধি ('আক্বল্)।

তাছাড়া বস্তুর ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া একমুখী অর্থাৎ 'হ্যা' বা 'না' হয়ে থাকে এবং প্রতিক্রিয়াটি টিকে থাকে বা বিলুপ্ত হয়ে যায়। বস্তুর ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় দ্বিধাদ্বন্দ্ব বা সন্দেহ-সংশয়ের বা বিতর্কের অবকাশ নেই। কিন্তু আমরা আমাদের অভিজ্ঞতায় অনেক বিষয়েই উপসংহার বা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে গিয়ে এ ধরনের অবস্থার সম্মুখীন হই; এ ধরনের অবস্থা বিচারবুদ্ধির অস্তিত্বই প্রমাণ করে।

এছাড়া সৌন্দর্যচেতনা, শিল্পকলা, সাহিত্য ইত্যাদি সম্পূর্ণরূপেই বিচারবুদ্ধি ও অন্যান্য অবস্তুগত অভ্যন্তরীণ শক্তির সাথে সংশ্লিষ্ট। উদাহরণস্বরূপ, একটি ছোটগল্প রচনা, গল্পটির সংক্ষেপণের প্রয়োজন অনুভব করা ও সংক্ষেপণের কাজ আঞ্জাম দেয়া ইন্দ্রিয়নিচয়ের কাজ নয়, বিচারবুদ্ধির কাজ।

যাই হোক, মোদ্দা কথা, বিচারবুদ্ধি এক অবস্তুগত অভ্যন্তরীণ শক্তি। অবশ্য তার প্রধান কর্মক্ষেত্র মস্তিষ্ক। তবে বিচারবুদ্ধিকে মস্তিষ্কের মধ্যে সীমাবদ্ধ মনে করা ঠিক হবে না।

বিচারবুদ্ধি সম্বন্ধে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এই যে, তা অন্যান্য তথ্যসংগ্রহ মাধ্যম কর্তৃক সংগৃহীত তথ্যাদি বিশ্লেষণ করে সে সবের ভুল নির্ণয় ও নিরসন করতে পারে। বিচারবুদ্ধি বুঝতে পারে, চোখ সূর্যকে ছোট দেখলেও আসলে সূর্য অত ছোট নয়; একই পানি দুই হাতে গরম ও ঠা-া অনুভূত হলেও আসলে ঐ পানির তাপমাত্রা একটিই, দু'টি নয়, বরং দুই হাত ইতিপূর্বে দুই ধরনের তাপমাত্রায়

ছিলো বলেই এরূপ অনুভব করছে; গত রাতের জীবন বাস্তব বা বস্তুগত জগতের অভিজ্ঞতা ছিলো, কিন্তু গত রাতের স্বপ্ন বস্তুগত জগতের অভিজ্ঞতা ছিলো না, যদিও দু'টি অভিজ্ঞতার একটিও এখন বর্তমান নেই; .... ।

অবশ্য বিচারবুদ্ধিও ভুল করতে পারে এবং ভুল উপসংহারে উপনীত হতে পারে। তবে বিচারবুদ্ধি পর্যালোচনা ও গবেষণার মাধ্যমে স্বীয় ভুল চিহ্নিত করে তা সংশোধন করতে পারে। কিন্তু ইন্দ্রিয়নিচয়ের সে ক্ষমতা নেই। যেমন ঃ কোনো যান্ত্রিক উপকরণের সাহায্য গ্রহণ ছাড়াই খোলা চোখ একই জায়গা থেকে সূর্যকে লক্ষ বার দেখলেও ছোটই দেখতে পাবে।

অন্তঃকরণে উদ্ভূত জ্ঞান

মানুষের মধ্যে আরেকটি জ্ঞানমাধ্যম রয়েছে, তা হচ্ছে তার অন্তঃকরণ (قلب)। এর মাধ্যমে প্রাপ্ত জ্ঞানকে অন্তঃকরণজাত বা অন্তঃকরণে উদ্ভূত জ্ঞান (علم قلبى) বলা যেতে পারে। বিচারবুদ্ধি ও অন্তঃকরণের মধ্যে পার্থক্য এখানে যে, বিচারবুদ্ধি প্রত্যক্ষ (ইন্দ্রিয়বহির্ভূত) অভিজ্ঞতা থেকে (যেমন ঃ স্বীয় অস্তিত্ব সম্বন্ধে) অথবা ইন্দ্রিয়লব্ধ তথ্যাদি বিশ্লেষণের মাধ্যমে জ্ঞানে উপনীত হয়, কিন্তু অন্তঃকরণের জ্ঞান এমন যা এরূপ কার্যকারণ ছাড়াই অন্তঃকরণে উদ্ভূত হয়। যেমন ঃ যথাযথ চিন্তাগবেষণা ছাড়াই কারো মনে কোনো প্রশ্নের জবাব বা কোনো সমস্যার সমাধান ভেসে উঠলো। তেমনি কোনো ব্যক্তি সম্পর্কে পূর্ব ধারণা ছাড়াই তাকে প্রথম বারের মতো দেখা মাত্রই অন্তরে তার প্রতি ভালোবাসা, স্নেহ-মমতা, ভয়, আশা, শ্রদ্ধা, ভক্তি ইত্যাদি জেগে উঠতে পারে এবং পরে তা যথার্থ বলে প্রমাণিত হতে পারে। অবশ্য ইন্দ্রিয়লব্ধ পূর্বাহ্নিক তথ্য বা বিচারবুদ্ধির প্রভাবেও এ ধরনের অনুভূতি সৃষ্টি হতে পারে, তবে এ সবের প্রভাব ছাড়াও, দৃশ্যতঃ কোনো কারণ ছাড়াও হতে পারে। দ্বিতীয়োক্ত ধরনের অনুভূতি অন্তঃকরণে উদ্ভূত জ্ঞান, যদিও প্রথমোক্ত

ও দ্বিতীয়োক্ত উভয় ধরনের জ্ঞানেরই শারীরিক প্রতিক্রিয়ার প্রধান কেন্দ্র হচ্ছে হৃদপি- ।

কারো প্রতি ভালোবাসা, স্নেহ-মমতা, ভয়, আশা, শ্রদ্ধা, ভক্তি ইত্যাদি জাগ্রত হওয়ার বিষয়টি সহজাত প্রবৃত্তির ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া হিসেবে একে সহজাত জ্ঞান বলে মনে হতে পারে । কিন্তু এখানে সহজাত জ্ঞান থেকে পার্থক্য এই যে, মানুষের মূল অনুভূতিগুলো সহজাত, কিন্তু তার প্রয়োগক্ষেত্র তথা কা'রা এগুলোর উপযুক্ত সে সংক্রান্ত জ্ঞান কেবল ইন্দ্রিয়নিচয়ের দ্বারা অর্জিত তথ্যাদি বিচারবুদ্ধির দ্বারা বিশ্লেষণের মাধ্যমেই অর্জিত হয়ে থাকে এবং কেবল এর পরেই ঐ সব অনুভূতি সে সব পাত্রের দিকে প্রবাহিত হয় । কিন্তু তা যদি ইন্দ্রিয়নিচয়ের দ্বারা অর্জিত তথ্য ও বিচারবুদ্ধির বিশ্লেষণ ছাড়াই, দৃশ্যতঃ বিনা কারণেই ঘটে, যেমন ঃ একজন লোককে প্রথম বারের মতো দেখেই মনে হলো লোকটি বিপজ্জনক, তাহলে তা অন্তঃকরণে উদ্ভূত জ্ঞান ।

বিচারবুদ্ধি ও অন্তঃকরণের মধ্যকার পার্থক্য ও পারস্পরিক সম্পর্কের একটি দিক হচ্ছে এই যে, বিচারবুদ্ধির জ্ঞানের উদয়, বিচার-বিশ্লেষণ ও উপসংহার যেখানে মস্তিষ্কে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া ঘটায় সেখানে অন্তঃকরণে উদ্ভূত জ্ঞান অন্তঃকরণ থেকে মস্তিষ্কে স্থানান্তরিত হয়, যদিও পরে বিচারবুদ্ধি সে সব নিয়ে বিচার-বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনা করতে পারে এবং সে সবকে শক্তিশালী বা দুর্বল করতে পারে ।

এ প্রসঙ্গে একটি কথা উল্লেখ করা বিশেষভাবে প্রয়োজন, তা হচ্ছে, অনেকে শরীরের হৃদপি-কেই "ক্বাল্ব্" বলে মনে করেন । যদিও আরবী ভাষায় হৃদপি-কেও "ক্বাল্ব্" বলা হয়, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে অন্তঃকরণ বা হৃদয় (ক্বাল্ব্) কোনো বস্তুগত অঙ্গ নয়, যদিও উভয়ের মধ্যে একটি যোগসূত্র রয়েছে । অনেক ভাষায়ই যেমন এক শব্দ একাধিক অর্থে ব্যবহৃত হয়, আরবী ভাষায়ও তদ্রূপ ব্যবহারের প্রচলন আছে । আরবী ভাষায় হৃদপি- এবং অন্তঃকরণ বা হৃদয় উভয়

অর্থেই “ক্বাল্ব্” শব্দ ব্যবহৃত হয়। বিশেষ করে অন্তঃকরণ বা হৃদয়ের অনুভূতি হৃদপিে- ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া করে বিধায় অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবেই এ উভয় অর্থেই শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে অন্তঃকরণ বা হৃদয় হচ্ছে মানবসত্তায় নিহিত একটি অবস্তুগত জ্ঞানকেন্দ্র, আর হৃদপিে-র মূল কাজ হচ্ছে রক্ত বিশোধন ও সঞ্চালন।

যা-ই হোক, “ক্বাল্ব্”-এর জ্ঞান দুই ধরনের। ইতিপূর্বে যেমন ইঙ্গিত করা হয়েছে, এর এক ধরনের জ্ঞানের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বা বিচারবুদ্ধির আওতাধীন জগতের সাথে যোগসূত্র থাকে। অর্থাৎ এ দুই জগতের কোনো তথ্য মস্তিষ্কে জমা হয়ে তা বিচারবুদ্ধির বিশ্লেষণ ছাড়াই অন্তরে স্থানান্তরিত হতে এবং তাকে কেন্দ্র করে অন্তরে বিশেষ অনুভূতি সৃষ্টি হতে পারে যা পরে সেখান থেকে মস্তিষ্কে স্থানান্তরিত হয়। যেমন ঃ একজন মানুষকে দেখামাত্রই অন্তরে তার প্রতি ভয় বা ঘৃণা জাগ্রত হতে পারে যদিও দৃশ্যতঃ তার মধ্যে তাকে ভয় বা ঘৃণা করার মতো কোনো কারণ দেখা যায় না এবং বিচারবুদ্ধি তাকে ভয় বা ঘৃণা করার সপক্ষে রায় দেয় না। এমনকি ক্ষেত্রবিশেষে মানুষ ইন্দ্রিয়লব্ধ তথ্যাদি ও বিচারবুদ্ধির ফয়সালার বিপরীতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে ও তার ভিত্তিতে কোনো কাজ করে বা কোনো কাজ পরিহার করে কেবল এ কারণে যে, মন বলছে, এ কাজটি করা উচিত অথবা করা উচিত নয়।

ক্ষেত্রবিশেষে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ও বিচারবুদ্ধির আওতাভুক্ত বিষয় এমন হতে পারে যে, সে ব্যাপারে সঠিক ফয়সালায় উপনীত হবার পথে স্থানগত, কালগত, পরিবেশগত বা পরিস্থিতিগত বাধা থাকতে পারে। এরূপ ক্ষেত্রে ক্বাল্ব্ ব্যক্তিকে পথপ্রদর্শন করতে পারে। অর্থাৎ ব্যক্তির পক্ষে অভিজ্ঞতা হাছিল, গবেষণা ও বিচারবুদ্ধির বিশ্লেষণ ছাড়াই কেবল অন্তরের অনুভূতির ভিত্তিতে কোনো বিষয়ে সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভব হতে পারে।

মানুষের শরীরের বস্তুগত অঙ্গ হৃদপি- ছাড়াও যে তার মধ্যে অন্তঃকরণ বা হৃদয় নামক একটি অবস্তুগত শক্তি রয়েছে কোরআন মজীদের আয়াত থেকে তার সন্ধান পাওয়া যায়। আল্লাহ্ তা'আলা অতীতের বহু শক্তিশালী জাতিকে ধ্বংস করে দেয়ার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়ার পর এরশাদ করেছেন ঃ

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ

"নিঃসন্দেহে এতে তার জন্য উপদেশ রয়েছে যে ব্যক্তি ক্বাল্ব্-এর অধিকারী।" (সূরাহ্ ক্বাফ্ ঃ ৩৭)

বলা বাহুল্য যে, এখানে শরীরের বস্তুগত হৃদপি-ের কথা বলা হয় নি, কারণ, তা প্রত্যেকেরই রয়েছে যা না থাকলে কোনো মানুষের পক্ষে বেঁচে থাকা সম্ভব নয়।

বিভিন্ন জাতির ধ্বংসের কারণ সম্বন্ধে গবেষণা করলে বহু প্রাকৃতিক, বস্তুগত, রাজনৈতিক ও সামাজিক কার্যকারণ খুঁজে পাওয়া যাবে। কিন্তু নির্মল অন্তঃকরণের অধিকারী ব্যক্তি এ ধরনের প্রতিটি জাতির পাপাচারের ক্ষেত্রে সকল মাত্রা ছাড়িয়ে যাবার পর ধ্বংস হবার ঘটনা অবহিত হয়ে অনুভব করতে পারেন যে, এ হচ্ছে আল্লাহ্ তা'আলার এক অমোঘ বিধান, যদিও তা প্রাকৃতিক বা মানবিক কার্যকারণের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হয়ে থাকে।

ক্বাল্বের দ্বিতীয় ধরনের জ্ঞান হচ্ছে এমন যার সাথে ইন্দ্রিয়লব্ধ বা বিচারবুদ্ধিজাত তথ্যের কোনোরূপ যোগসূত্র নেই। বরং বস্তুগত ও বিচারবুদ্ধিগত কার্যকারণের সংযোগ ছাড়াই অন্তঃকরণে বা হৃদয়ে কোনো তথ্য জাগ্রত হয় এবং তাতে প্রত্যয়ও সৃষ্টি হয়। ওয়াহী ও ইল্হাম্ এ পর্যায়ের জ্ঞান। এ ক্ষেত্রে তা শব্দ ও বাক্যের সাহায্যে তৈরী বাণী, কোনো স্থির বা চলমান দৃশ্য, অথবা উভয়ই হতে পারে যা নবী-রাসূলগণ ('আঃ) পেয়েছিলেন। আল্লাহ্র কোনো কোনো ওয়ালীও এরূপ বাণী লাভ করেন, যেমন ঃ হযরত মূসা ('আঃ)-এর মাতা লাভ করেছিলেন।

অন্যদিকে অন্তঃকরণে ভেসে ওঠা দৃশ্য বা অকাট্য তথ্য আকারেও কোনো জ্ঞান কেউ পেতে পারেন এবং তা অকাট্য প্রত্যয় উৎপাদক হয়ে থাকে। নবী-রাসূলগণ ('আঃ) ও আল্লাহ্‌র ওয়ালীগণ ছাড়াও যে কোনো লোকই এ ধরনের জ্ঞান লাভ করতে পারে (যেমন অনেক বিজ্ঞানী লাভ করেন)। এমনকি নাস্তিক ব্যক্তির জন্যও এরূপ জ্ঞান লাভ করা অসম্ভব নয়।

বাণীর আকারে হলে এরূপ জ্ঞানকে 'পঠনযোগ্য ওয়াহী' (وحى متلوء) বলা হয়, আর বাণী আকারে না হলে এরূপ জ্ঞানকে 'পঠন-অযোগ্য ওয়াহী' (وحى غير متلوء) বা প্রেরণা (الهام – ইল্‌হাম্‌) বা 'প্রত্যক্ষ অনুভূতি' (intuition) বলা হয়।

বর্ণনাসূত্রে প্রাপ্ত জ্ঞান

ভিন্ন এক দৃষ্টিকোণ থেকে জ্ঞানকে সহজাত, ইন্দ্রিয়লব্ধ, বিচারবুদ্ধিজাত ও অন্তঃকরণে উদ্ভূত জ্ঞান – এ চার ভাগে ভাগ করার পাশাপাশি বর্ণনাসূত্রে প্রাপ্ত জ্ঞান বা উদ্ধৃত জ্ঞান (علم نقلى) নামেও একটি বিভাগ নির্দেশ করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে কোনো ব্যক্তি অন্য ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের ইন্দ্রিয়লব্ধ, বিচারবুদ্ধিজাত ও অন্তঃকরণে উদ্ভূত যে জ্ঞান বর্ণনাসূত্রে (লেখা ও কথা নির্বিশেষে) অবগত হয় তাকেই বর্ণনাসূত্রে প্রাপ্ত বা উদ্ধৃত জ্ঞান বলা হয়। এ ধরনের জ্ঞান যদি বিচারবুদ্ধিজাত ও অন্তঃকরণে উদ্ভূত জ্ঞান হয় এবং যথাযথভাবে স্থানান্তরিত হয় অর্থাৎ বর্ণনা ও গ্রহণ যথাযথ হয় তাহলে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে দাতা ও গ্রহীতা উভয়ের জ্ঞান একই পর্যায়ের হবে। তবে বিচারবুদ্ধির জ্ঞানের ক্ষেত্রেই এটা যথাযথভাবে হওয়া সম্ভব। অন্তঃকরণে উদ্ভূত কোনো কোনো জ্ঞানের 'যথাযথ' স্থানান্তর ও যার কাছে স্থানান্তরিত হয় তার পক্ষে তা যথাযথভাবে ধারণ করতে পারা 'প্রায় অসম্ভব' ব্যাপার। অবস্তুগত সমুন্নত সত্তা ও জগতসমূহ সংক্রান্ত জ্ঞান এ পর্যায়ের।

অন্যদিকে ইন্দ্রিয়লব্ধ জ্ঞান স্থানান্তরের বিষয়টি ভিন্ন ধরনের। প্রকৃত পক্ষে ব্যক্তি ইন্দ্রিয়নিচয় দ্বারা যে তথ্য আহরণ করে, বা প্রচলিত কথায়, যে জ্ঞান অর্জন করে, তা হুবহু অন্যের মাঝে স্থানান্তরিত করতে পারে না, কেবল এ সংক্রান্ত একটা প্রতীকী ধারণা স্থানান্তরিত করতে পারে মাত্র। উদাহরণস্বরূপ, কোনো ব্যক্তি যখন একটি সুন্দর দৃশ্য দেখার পর তা অন্যের নিকট মুখে বা লিখে বর্ণনা করে তখন তার পক্ষে পাঠক-পঠিকা বা শ্রোতাকে হুবহু নিজের অভিজ্ঞতা প্রদান করা সম্ভব হয় না; প্রতীকী শব্দাবলীর সাহায্যে ধারণা প্রদান করা সম্ভব হয় মাত্র। অবশ্য বর্ণনা যতো নিখুঁত হবে পাঠক-পাঠিকা বা শ্রোতার পক্ষে স্বীয় কল্পনানেত্রে ততোটাই কাছাকাছি দৃশ্য রচনা করা সম্ভব হবে। কিন্তু কখনোই তা বক্তার বা লেখকের দেখা দৃশ্যের হুবহু অনুরূপ হবে না। এমনকি তার ভিডিও-চিত্র প্রদর্শন করা হলেও ভিডিও-দর্শনকারীর জন্য অভিজ্ঞতা অর্জনকারীর ন্যায় হুবহু জ্ঞান অর্জিত হবে না। কারণ, সংশ্লিষ্ট চলমান দৃশ্যাবলী ও শব্দ (sound) ছাড়াও সেখানকার পরিবেশগত অনেক বিষয়, ধরুন বাতাসের স্পর্শ ইত্যাদি অনেক কিছু ব্যক্তির অভিজ্ঞতায় শামিল থাকে যা চলচ্চিত্রে অনুপস্থিত থাকে।

তেমনি একটি সুর, কোনো বস্তুর স্বাদ, কোনো কিছুর ঘ্রাণ ও কোনো বস্তুর স্পর্শের অনুভূতি সম্পর্কেও একই কথা প্রযোজ্য। অর্থাৎ এগুলো মৌখিক বা লিখিত বর্ণনা, এমনকি রেকর্ড বা চলচ্চিত্রের মাধ্যমেও হুবহু পাঠক-পাঠিকা বা শ্রোতা-দর্শকের কাছে স্থানান্তরিত করা সম্ভবপর হয় না, কেবল এ সংক্রান্ত ধারণা প্রদান করা সম্ভব হয় মাত্র। যদিও লেখ্য বা মৌখিক বর্ণনার তুলনায় রেকর্ড বা চলচ্চিত্রের সাহায্যে প্রদত্ত ধারণা বাস্তবতার অধিকতর কাছিাকাছি হয়ে থাকে, কিন্তু তা হুবহু অভিজ্ঞতা অর্জনকারীর অনুভূতির ন্যায় হয় না।

অন্যদিকে পরীক্ষাগারে হাতে-কলমে পরীক্ষার মাধ্যমে যে জ্ঞান দেয়া হয় মূলতঃ তা আর উদ্ধৃত জ্ঞান থাকে না, বরং

জ্ঞান গ্রহণকারীর জন্যও পরীক্ষালব্ধ জ্ঞানে পরিণত হয়, যদিও অন্য একজন তাকে সাহায্য করেছে বা ইতিপূর্বে সে অন্যের কাছ থেকে যে উদ্ধৃত জ্ঞান পেয়েছে তা থেকে এ ব্যাপারে সে সাহায্য নিয়েছে।

ইন্দ্রিয়লব্ধ জ্ঞান স্থানান্তরের ক্ষেত্রে দু'টি শর্ত বিদ্যমান থাকা অপরিহার্য। প্রথমতঃ গ্রহীতার সংশ্লিষ্ট ইন্দ্রিয় অর্থাৎ তার যে ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে অন্যের ইন্দ্রিয় দ্বারা সংগৃহীত তথ্যাদি তার মধ্যে স্থানান্তরিত করা হবে তার সে ইন্দ্রিয়টি অক্ষত ও অবিকৃত থাকতে হবে। দ্বিতীয়তঃ গ্রহীতার মধ্যে সংশ্লিষ্ট বর্ণনার বিষয়বস্তুর অনুরূপ বিষয়বস্তু বা তার কাছাকাছি বিষয় সম্পর্কে পূর্বাহ্নিক ইন্দ্রিয়জাত জ্ঞান থাকতে হবে। কেবল তাহলেই গ্রহীতার পক্ষে স্বীয় অভিজ্ঞতার সাথে মিলিয়ে অন্যের অভিজ্ঞতাভুক্ত বিষয় সম্পর্কে কোনো না কোনো পর্যায়ের ধারণা লাভ করা সম্ভব, অন্যথায় নয়। যেমন ঃ চক্ষুষ্মান ব্যক্তিকে বর্ণনার দ্বারা একটি 'দৃশ্য' সম্বন্ধে মোটামুটি ধারণা দেয়া সম্ভব। ধরুন, যে ব্যক্তি তাজমহল দেখে নি তাকে বর্ণনার দ্বারা তাজমহল সম্পর্কে তাজমহল-দর্শকের অনুরূপ ধারণা দেয়া সম্ভব নয়, তবে মোটামুটি ধারণা দেয়া সম্ভব। অবশ্য বর্ণনার সাথে সাথে ছবি দেখানো হলে দর্শক-শ্রোতার এতদসংক্রান্ত জ্ঞান উন্নততর ও অভিজ্ঞতা অর্জনকারীর অধিকতর কাছাকাছি হবে। আর রঙিন ছবি ও ভিডিও-চিত্রের সাহায্যে পর্যায়ক্রমে অধিকতর উন্নত স্তরের ধারণা দেয়া ও তার এ সংক্রান্ত জ্ঞানকে অভিজ্ঞতা অর্জনকারীর জ্ঞানস্তরের আরো কাছাকাছি নিয়ে আসা সম্ভব হবে। কিন্তু এতো কিছু সত্ত্বেও তার জ্ঞান হুবহু তাজমহল-পরিদর্শনকারীর এতদসংক্রান্ত জ্ঞানের অনুরূপ হবে না। কিন্তু যে ব্যক্তির চোখ নেই তাকে, বিশেষতঃ জন্মান্ধকে তাজমহলের সৌন্দর্য সম্বন্ধে কোনো ধারণাই দেয়া সম্ভব হবে না।

অন্যান্য ইন্দ্রিয়লব্ধ জ্ঞান স্থানান্তরের ক্ষেত্রেও এটা সত্য।

অবশ্য বর্ণিত সূত্রে প্রাপ্ত জ্ঞানের ভিত্তিতে তৈরী পটভূমিকার কারণে ব্যক্তি বর্ণনাকারীর অনুরূপ অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য উদ্যোগী হতে পারে। যেমন ঃ সে তাজমহলের সৌন্দর্য দেখতে যেতে পারে, সমুদ্রের শো-শো শব্দ শোনার জন্য সমুদ্রে যেতে পারে, যে নতুন ফলের প্রশংসা সে শুনেছে তা সংগ্রহ করে খেয়ে দেখতে পারে। সে ক্ষেত্রে তার এতদসংক্রান্ত জ্ঞান আর বর্ণনাসূত্রে লব্ধ জ্ঞানের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলো না, বরং ইন্দ্রিয়লব্ধ বা অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানে পরিণত হলো।

অন্ধভাবে গ্রহণীয় জ্ঞান

জ্ঞানকে অন্য এক বিবেচনায় দুই ভাগে ভাগ করা যেতে পারে ঃ বিচারবুদ্ধি দ্বারা আয়ত্তযোগ্য জ্ঞান (علم تعقلی) ও অন্ধভাবে গ্রহণীয় জ্ঞান (علم تعبدی)। সহজাত জ্ঞান, ইন্দ্রিয়লব্ধ জ্ঞান, অভিজ্ঞতালব্ধ বা পরীক্ষালব্ধ জ্ঞান এবং অনেক উদ্ধৃত জ্ঞানই প্রথমোক্ত ধরনের জ্ঞানের মধ্যে শামিল। আর দ্বিতীয়োক্ত ধরনের জ্ঞান যদিও পুরোপুরিভাবে বিচারবুদ্ধির ধারণক্ষমতার বহির্ভূত নয়, তবে তা সর্বজনীন নয়। তাই এ জ্ঞান যার আছে তাঁর কাছ থেকে অন্ধভাবে গ্রহণ করা ছাড়া গত্যন্তর নেই। উদাহরণস্বরূপ, লাওহে মাহফূযের কথা ধরা যাক। এ ক্ষেত্রে হযরত রাসূলে আকরাম (ছ্বাঃ)-এর মাধ্যমে প্রাপ্ত কোরআন মজীদের তথ্য মেনে নেয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই। কারণ, সংশ্লিষ্ট তথ্যের সত্যাসত্য যাচাই করা এবং স্বরূপ উদ্ঘাটন করা বিচারবুদ্ধি এবং পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণের আওতাবহির্ভূত ব্যাপার।

এ পরিভাষা দু'টি ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে কিছুটা পরিবর্তিত অর্থেও ব্যবহৃত হয়। তা হচ্ছে, যে তথ্য কেবল বিশেষজ্ঞদের পক্ষেই জানা সম্ভব তা তাঁদের জন্য বিচারবুদ্ধির আয়ত্তাধীন জ্ঞান (علم تعقلی) এবং সাধারণ মানুষদের জন্য অন্ধভাবে গ্রহণীয় জ্ঞান (علم تعبدی)। কারণ, এ ক্ষেত্রে সাধারণ মানুষের জন্য বিশেষজ্ঞের কথা

মেনে নেয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই। তবে এ ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞের কথা চোখ বুঁজে মেনে নেয়ার আগে স্বীয় বিচারবুদ্ধির দ্বারা বিশেষজ্ঞকে অর্থাৎ প্রকৃতই তিনি বিশেষজ্ঞ, নাকি বিশেষজ্ঞ হবার মিথ্যা দাবীদার তা পরীক্ষা করে দেখে নিশ্চিত হতে হবে এবং বিশেষজ্ঞ মিথ্যা বলবেন না সে ব্যাপারেও নিশ্চিত হতে হবে বা প্রত্যয়ে উপনীত হতে হবে। যেমন ঃ আমরা যখন অসুস্থ হই তখন চিকিৎসকের কাছে যাই, তবে বিচারবুদ্ধি নির্দেশিত বিভিন্ন পন্থায়, যেমন ঃ চিকিৎসাক্ষেত্রে খ্যাতি, সার্টিফিকেট, সরকারী নিবন্ধন ইত্যাদির ভিত্তিতে আমরা মোটামুটি নিশ্চিত হই যে, ঐ ব্যক্তি চিকিৎসক হবার মিথ্যা দাবী করছেন না; এ কারণেই নিশ্চিন্ত মনে তাঁর কাছে যাই।

অন্যদিকে সর্বজনীন বিচারবুদ্ধির ধারণযোগ্য বিষয়ে অন্যের কথা মেনে নেয়া এবং বিশেষজ্ঞ হবার দাবীদার ব্যক্তির গ্রহণযোগ্যতা সম্বন্ধে বিচারবুদ্ধির দ্বারা বিচার বা অনুসন্ধান পূর্বক নিশ্চিত না হয়েই তার কথা মেনে নেয়া বিচারবুদ্ধির দৃষ্টিতে নিন্দনীয় কাজ। এরূপ ক্ষেত্রে ব্যক্তি বিশেষজ্ঞত্বের দাবীদার ব্যক্তির কাছ থেকে যে ধারণা লাভ করে তাকে নেতিবাচক ও নিন্দনীয় অর্থে تعبد বা অন্ধ বিশ্বাস বলা হয়। বস্তুতঃ এ ধরনের অন্ধ বিশ্বাস জ্ঞানের পর্যায়ে পড়ে না।

কোরআন মজীদের দৃষ্টিতে জ্ঞানমাধ্যম

সর্বজনীনভাবে গ্রহণযোগ্য বিচারবুদ্ধির পর্যালোচনায় যে জ্ঞানমাধ্যমগুলোর সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে তা হচ্ছে ঃ সহজাত প্রবণতা, বিচারবুদ্ধি, ইন্দ্রিয়নিচয় ও অন্তঃকরণ বা হৃদয় (قلب)। এ

মাধ্যমগুলো এমন যে, এগুলোকে আস্তিক-নাস্তিক নির্বিশেষে সকলেই জ্ঞানমাধ্যমরূপে স্বীকার করতে বাধ্য, অবশ্য কেউ গোঁয়ার্তুমি করে বা অন্ধভাবে এর মধ্য থেকে কোনোটিকে অস্বীকার করতে চাইলে সে কথা স্বতন্ত্র এবং তা ধর্তব্যের মধ্যে নয়। আমরা কোরআন মজীদেও জ্ঞানমাধ্যম হিসেবে এগুলোর উল্লেখ দেখতে পাই।

সহজাত জ্ঞান ঃ

কোরআন মজীদে আমরা মানুষের সত্তা (نفس) বা প্রকৃতি (فطرة)-এর মধ্যে আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে সহজাত জ্ঞান নিহিত রাখার কথা উল্লেখ দেখতে পাই। এরশাদ হয়েছে ঃ

□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□. □□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□

.□□□□□□□□□□□□□

"শপথ সেই প্রাণসত্তার এবং তার তিনি যা সুসংহত করেছেন, অতঃপর তার মধ্যে তার পাপের (ও ধ্বংসের) আর (তা থেকে) বেঁচে থাকা (-এর জ্ঞান) ইল্হাম্ করে (সত্তায় প্রদান করে) দিয়েছেন।" (সূরাহ্ আশ্-শাম্স্ ঃ ৭-৮)

বলা বাহুল্যযে, ক্ষুধা-তৃষ্ণা ইত্যাদি সংক্রান্ত সহজাত জ্ঞান এতোই সুস্পষ্ট ও সর্বজনগ্রাহ্য যে, কোরআন মজীদ তার উল্লেখের প্রয়োজন বোধ করে নি, বরং এমন এক সহজাত জ্ঞানের কথা বলেছে যে সম্বন্ধে অনেকেই চিন্তা করে না, তবে উল্লেখের পর যে কেউই সামান্য চিন্তা করলেই তা অনুধাবন করতে সক্ষম।

এমন কতোগুলো কাজ আছে যা আস্তিক-নাস্তিক নির্বিশেষে প্রতিটি মানুষের কাছেই ভালো বা উচিত বলে মনে হয়, যেমন ঃ সত্য কথা বলা, বিশ্বস্ততা রক্ষা করা, বড়কে সম্মান করা, ছোটকে স্নেহ করা, দরিদ্র ও অসহায়কে সাহায্য ও সহায়তা করা, আমানত প্রত্যর্পণ করা ইত্যাদি। অন্যদিকে এমন কতগুলো কাজ আছে যা

প্রতিটি মানুষের কাছেই মন্দ বা বর্জনীয় বলে মনে হয়, যেমন ঃ মিথ্যা বলা, বিশ্বাসঘাতকতা করা, আমানত আত্মসাৎ করা, চুরি-ডাকাতি করা, নিষ্ঠুরতার আশ্রয় নেয়া, অহঙ্কার ও ঔদ্ধত্য প্রকাশ করা ইত্যাদি। কোনোরূপ ধর্মীয় বা নৈতিক শিক্ষা না পেলেও সহজাতভাবেই মানুষের মধ্যে এ জ্ঞানের উন্মেষ ঘটে (তা কার্যতঃ সে তা অনুসরণ করুক বা না-ই করুক)।

ইন্দ্রিয়নিচয় ঃ

ইন্দ্রিয়নিচয় যে জ্ঞান আহরণের মাধ্যম তা কোরআন মজীদে সুস্পষ্ট ভাষায় উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন, এরশাদ হয়েছে ঃ

□□□□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□ □□

□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□

. □□□□□□□□□□□□□□□ □ □□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□

"আর আল্লাহ্ তোমাদেরকে তোমাদের মায়েদের গর্ভ থেকে (এমন অবস্থায়) বের করে এনেছেন যে, তোমরা কোনো কিছুই জানো না এবং তিনি তোমাদের জন্য শ্রবণশক্তি, দর্শনশক্তি ও অন্তঃকরণ সৃষ্টি করেছেন; আশা করা যায় যে, তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে।" (সূরাহ্ আন্-নাহ্ল্ ঃ ৭৮)

কোরআন মজীদের বিভিন্ন আয়াতে ইন্দ্রিয়নিচয় ব্যবহারের মাধ্যমে জ্ঞানার্জনের জন্য উপদেশ দেয়া হয়েছে। যেমন, ইন্দ্রিয়লব্ধ জ্ঞানের সবচেয়ে বড় মাধ্যম চোখ; কোরআন মজীদের বিভিন্ন আয়াতে চর্মচক্ষুর কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়া বিভিন্ন আয়াতে বিদেশ ভ্রমণের কথা বলা হয়েছে এবং বলা বাহুল্য যে, বিদেশ ভ্রমণের প্রাথমিক লক্ষ্য হচ্ছে নতুন নতুন জিনিস ও দৃশ্য চাক্ষুষভাবে দর্শন। তবে আল্লাহ্ তা'আলা উচ্চতর লক্ষ্যে অর্থাৎ শিক্ষা গ্রহণের

লক্ষ্যে ভ্রমণকে ব্যবহারের জন্য উপদেশ দিয়েছেন। এক আয়াতে এরশাদ হয়েছে ঃ

□□□□ □□□□□□□□ □□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□

□□□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□ □□□□□□

“(হে রাসূল! তাদেরকে) বলুন, তোমরা ধরণীর বুকে পরিভ্রমণ করো এবং (দেখে) মনোযোগ সহকারে অনুধাবন করো যে, (তোমাদের) পূর্ববর্তীদের পরিণতি কেমন হয়েছিলো।” (সূরাহ্ আর্-রূম ঃ ৪২)

সুস্পষ্ট যে, এখানে চাক্ষুষ দেখাকে অনুসন্ধিৎসা সহকারে তথ্য সংগ্রহ করার কাজে ব্যবহার করতে তথা পর্যবেক্ষণ করতে বলা হয়েছে অর্থাৎ বিচারবুদ্ধির সাহায্যে ইন্দ্রিয়জ চক্ষু লব্ধ তথ্য থেকে শিক্ষা গ্রহণের কথা বলা হয়েছে।

অন্য বহু আয়াতে শ্রবণশক্তির সাহায্যে তথ্য সংগ্রহ করা হয় সেদিকে ইঙ্গিত রয়েছে। যেমন, এরশাদ হয়েছে ঃ

.... □□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□

“অতঃপর সে (ইমরাআতুল ‘আযীয) যখন তাদের ষড়যন্ত্রের কথা শুনলো ....।” (সূরাহ্ ইউসুফ ঃ ৩১)

এ আয়াতে কথা কানে আসা থেকে তথ্য সংগ্রহ বা জ্ঞান হাছ্বিলের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। অন্যত্র মনোযোগ দিয়ে শুনে জ্ঞানার্জনের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এরশাদ হয়েছে ঃ

□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□ □

“অতএব, (হে রাসূল!) সেই বান্দাহ্দেরকে সুসংবাদ দিন যারা বক্তব্য শ্রবণ করে এবং এরপর তার মধ্য থেকে যা অধিকতর উত্তম তার অনুসরণ করে।” (সূরাহ্ আয্-যুমার্ ঃ ১৭-১৮)

এ আয়াত থেকেও শ্রবণশক্তির তথ্যসংগ্রহমাধ্যম হওয়ার স্বীকৃতি প্রমাণিত হয়। তবে তথ্য যাচাই-বাছাই করা যে শ্রবণযন্ত্রের কাজ নয়, বরং বিচারবুদ্ধির কাজ সে ইঙ্গিতও এতে রয়েছে।

অন্যত্র এরশাদ হয়েছে ঃ

□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□

□□□□ □□□□□□□□□□□□ □ □□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□□ . □□□□

□□□□□□□□ □□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□ □

"তারা কি (কতক ক্ষেত্রে হলেও) (চাক্ষুষভাবে) দেখে নি যে, আল্লাহ্ কীভাবে সৃষ্টির সূচনা করেন? আর এরপর তিনিই তাকে প্রত্যাবর্তন করাবেন। নিঃসন্দেহে আল্লাহ্র জন্য এ কাজ খুবই সহজ। (হে রাসূল! তাদেরকে) বলুন, তোমরা ধরণীর বুকে পরিভ্রমণ করো এবং (চাক্ষুষভাবে দেখে) মনোযোগ সহকারে পর্যবেক্ষণ করে ভেবে দেখো যে, কীভাবে তিনি সৃষ্টির সূচনা করেছিলেন।"[১] (সূরাহ্ আল্-'আন্কাবূত্ ঃ ১৯-২০)

বলা বাহুল্য যে, এখানে দর্শনেন্দ্রিয়ের সাথে বিচারবুদ্ধির সংযোগেরও ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে।

কোরআন মজীদে আস্বাদনের কথা বহু আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে। বিশেষ করে জিহ্বা দ্বারা আস্বাদন প্রসঙ্গে নিম্নোক্ত আয়াতের

---

1 অত্র আয়াতে এ ইঙ্গিতও রয়েছে যে, ধরণীর বুকে এমন সব নিদর্শন আছে যা নিয়ে গবেষণা করা হলে সৃষ্টির সূচনাপ্রক্রিয়া ও অগ্রগতি সম্বন্ধে জানা যাবে। তাই দৃশ্যতঃ এ উপদেশ কোরআন নাযিলের অনেক পরবর্তীকালীন এমন এক প্রজন্মের উদ্দেশে যখন বিজ্ঞানের বিস্ময়কর উন্নতির ফলে মানুষের পক্ষে গবেষণা করে সৃষ্টির সূচনাপ্রক্রিয়া সম্বন্ধে জানা সম্ভব। অবশ্য خلق শব্দটি সৃষ্টিকরণ, প্রাণীকুল ও মানুষ – এ তিন অর্থেই ব্যবহৃত হয়। তবে এখানে প্রথম অর্থে অর্থাৎ সৃষ্টিকর্মের আদিসূচনা অর্থে ব্যবহৃত হওয়ার সম্ভাবনাই বেশী। মোদ্দা কথা, অত্র আয়াতে এতদসংক্রান্ত বিজ্ঞানের অগ্রগতি সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী নিহিত রয়েছে।

দৃষ্টান্ত পেশ করা যেতে পারে। হযরত আদম ('আঃ) ও হযরত হাওয়া ('আঃ) যে ইবলীসের দ্বারা প্রতারিত হয়ে নিষিদ্ধ বৃক্ষের স্বাদ গ্রহণ করেন সে প্রসঙ্গে এরশাদ হয়েছে ঃ

.... □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□□

"অতঃপর তারা উভয়ে যখন বৃক্ষটির স্বাদ গ্রহণ করলো।" (সূরাহ্ আল্-আ'রাফ ঃ ২২)

লক্ষণীয়, এখানে খাওয়ার কথা বলা হয় নি, স্বাদগ্রহণের কথা বলা হয়েছে। যদিও খাওয়ার মাধ্যমে একই সাথে ক্ষুন্নিবৃত্তি ও স্বাদগ্রহণ দুইই ঘটে থাকে, কিন্তু 'খাওয়া' বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে ক্ষুন্নিবৃত্তি বুঝানো। অন্যদিকে না খেয়েও (গলাধঃকরণ না করেও) শুধু জিহ্বা দ্বারা স্বাদ গ্রহণ করা যায়। জিহ্বা দ্বারা বিভিন্ন বস্তুর বিভিন্ন স্বাদ সম্পর্কে ও তা ভক্ষণোপযোগী কিনা সে সম্পর্কে জ্ঞান অর্জিত হয়। কিন্তু জিহ্বায় না লাগিয়ে সরাসরি পাকস্থলীতে বিভিন্ন বস্তু পৌঁছানো হলে পাকস্থলী বিভিন্ন ধরনের স্বাদ সম্পর্কে বা কী কী ধরনের বস্তু তার মধ্যে পৌঁছানো হয়েছে সে সম্পর্কে তথ্য সরবরাহ করতে পারবে না।

ত্বকের স্পর্শ-অনুভূতি সম্পর্কে বহু আয়াতে উল্লেখ রয়েছে; বিশেষভাবে হাত দিয়ে স্পর্শের কথাও উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন, এরশাদ হয়েছে ঃ

□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□ □□□□□□□□□□□□ □□□
□□□□□□□ □□ □□□□□□□ □

"(মূসা সাামেরীকে) বললো ঃ সুতরাং দূর হয়ে যাও; অবশ্যই তোমার জন্য এটাই নির্ধারিত যে, সারা জীবন (অনারোগ্য জঘন্য চর্মরোগের কারণে) তুমি বলবে ঃ আমাকে স্পর্শ করো না।" (সূরাহ্ ত্বা-হা ঃ ৯৭)।

মোট কথা, কোরআন মজীদ যে, ইন্দ্রিয়নিচয়কে জ্ঞান বা তথ্য আহরণের মাধ্যম হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই। অবশ্য কোরআন মজীদে ইন্দ্রিয়নিচয়ের মধ্যে শ্রবণেন্দ্রিয় ও দর্শনেন্দ্রিয়ের কথা সর্বাধিক বার উল্লিখিত হয়েছে। আর এটাই স্বাভাবিক। কারণ, মানুষ এ দু'টি ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমেই, বিশেষ করে দর্শনেন্দ্রিয়ের মাধ্যমে সর্বাধিক পরিমাণে তথ্যসংগ্রহের কাজ আঞ্জাম দিয়ে থাকে।

বিচারবুদ্ধি ঃ

কোরআন মজীদ বিচারবুদ্ধি (عقل)কে শুধু অন্যতম জ্ঞানমাধ্যম হিসেবেই স্বীকৃতি দেয় নি, বরং এর ওপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করেছে। কোরআন মজীদে عقل শব্দমূল হতে নিষ্পন্ন শব্দাবলী ৪৯ বার ব্যবহৃত হয়েছে; এর মধ্যে আট জায়গায় বিভিন্ন বিষয় উল্লেখের পর বলা হয়েছে যে, এতে সেই সব লোকের জন্য নিদর্শন/ নিদর্শনাদি রয়েছে যারা বিচারবুদ্ধি প্রয়োগ করে। যেমন, এরশাদ হয়েছে ঃ

□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□

□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□

□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□□□

.□□□□□□□□□□□□

"আর দিনরাত্রির পরিবর্তনে (বা পার্থক্য ঘটার মধ্যে) এবং আল্লাহ্ আকাশ থেকে যে রিয্ক্ব (বৃষ্টি) নাযিল করেছেন এবং তার সাহায্যে ধরণীকে এর মৃত্যুর পরে পুনর্জীবিত করেছেন তাতে, আর বায়ুর আবর্তন-পরিবর্তনে বিচারবুদ্ধি প্রয়োগকারীদের জন্য নিদর্শন রয়েছে।" (সূরাহ্ আল্-জাছিয়াহ্ ঃ ৫)

অনেকে لقوم يعقلون-এর অর্থ করেছেন "বুদ্ধিমান লোকদের জন্য"; এটা সঠিক অর্থ নয়। কারণ, সে ক্ষেত্রে لقوم عاقلون বলা হতো। আর মানসিক প্রতিবন্ধী ও বুদ্ধির বিকাশ ঘটে নি এমন শিশু ছাড়া সকলেই عاقل বা বুদ্ধিমান। আলোচ্য আয়াতে يعقلون ক্রিয়াপদ ব্যবহার থেকে সুস্পষ্ট যে, এতে 'বুদ্ধিমানদের' বুঝানো উদ্দেশ্য নয়, এমনকি বিচারবুদ্ধির অধিকারী সকল লোককে বুঝানোও উদ্দেশ্য নয়, বরং বিচারবুদ্ধি প্রয়োগকারীদের বুঝানোই উদ্দেশ্য।

এছাড়া কোরআন মজীদে ১৩ বার তাকিদ করে বলা হয়েছে افلا تعقلون. – "অতঃপর তোমরা কি বিচারবুদ্ধি প্রয়োগ করবে না? " অনেকে এর অর্থ করেছেন ঃ "তোমরা কি বোঝো না?" কিন্তু এরূপ অর্থ গ্রহণ করা ঠিক নয়। কারণ, তা বলতে চাওয়া হলে বলা হতো ঃ افلا تفهمون. অর্থাৎ 'বিষয়টি কি তোমাদের জন্য কঠিন বা জটিল এবং এ কারণে তোমরা বুঝতে পারছো না?' তাছাড়া 'বুঝতে না পারা' বলতে অনিচ্ছাকৃত বা সাধ্যাতীত অক্ষমতা বুঝায় এবং সে জন্য কাউকে তিরস্কার করা চলে না।

বস্তুতঃ 'আক্বল্ বা বিচারবুদ্ধির দ্বারা যা বুঝা সম্ভব তা সর্বজনীনভাবে সহজবোধগম্য বিষয়; বিচারবুদ্ধির সাহায্যে সহজেই তা বুঝা যেতে পারে। কিন্তু লোকেরা ইচ্ছাকৃতভাবেই বিচারবুদ্ধির প্রয়োগ থেকে দূরে থাকে। এ কারণেই এ জন্য তারা তিরস্কারের উপযুক্ত বিধায় কোরআন মজীদ তাদেরকে তিরস্কার করেছে।

অন্তঃকরণ ঃ

কোরআন মজীদে قلب (অন্তঃকরণ)কে একটি জ্ঞানমাধ্যম হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। হযরত জিবরাঈল ('আঃ) হযরত রাসূলে আকরাম (ছ্বাঃ)-এর অন্তঃকরণে কোরআন মজীদ পৌঁছে দেন। এরশাদ হয়েছে ঃ

قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ.

"(হে রাসূল!) বলুন ঃ যে ব্যক্তি জিবরাঈলের বিরুদ্ধে শত্রুতা পোষণ করে (সে জেনে রাখুক যে), অবশ্যই সে (জিবরাঈল্) আল্লাহর অনুমতিক্রমেই আপনার অন্তঃকরণে তা (কোরআন) নাযিল করে যা, (পূর্ব থেকে) যা তাদের সামনে বিদ্যমান আছে তার সত্যায়নকারী এবং তা (এ কোরআন) হচ্ছে মু'মিনদের জন্য হেদায়াত ও সুসংবাদস্বরূপ ।" (সূরাহ্ আল্-বাক্বারাহ্ ঃ ৯৭)

আরো এরশাদ হয়েছে ঃ

نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ

"তা (কোরআন) সহ বিশ্বস্ত চেতনা (জিবরাঈল্) আপনার অন্তঃকরণে নাযিল হয়েছে যাতে আপনি সতর্ককারীদের অন্যতম হন ।" (সূরাহ্ আশ্-শু'আরা ঃ ১৯৩-১৯৪) ।

অন্য এক আয়াতে এরশাদ হয়েছে ঃ

□□□□□□□ □□□□□□□ □□ □□□□□□□□□□□ □□□□□

"তাদের অন্তঃকরণ আছে, কিন্তু তা দ্বারা তারা হৃদয়ঙ্গম করে না ।" (সূরাহ্ আল্-আ'রাফ ঃ ১৭৯)

তবে এখানে উল্লেখযোগ্য যে, কোরআন মজীদে قلب শব্দটি ব্যাপকতর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে; বিচারবুদ্ধি প্রয়োগ, হৃদয়ঙ্গমকরণ, অনুধাবন এবং ওয়াহী ও ইল্হাম্ গ্রহণকে قلب-এর সাথে সম্পর্কযুক্ত করা হয়েছে । অর্থাৎ বিচারবুদ্ধি প্রয়োগ করা قلب-এরই কাজ । কোরআন মজীদে এরশাদ হয়েছে ঃ

□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□

□□□□□□□ □□□□□□□□□□□ □□□□□□

“তাহলে তারা কি ধরণীর বুকে পরিভ্রমণ করে নি যাতে তাদের এমন অন্তঃকরণ (قلب) হয় যার সাহায্যে তারা বিচারবুদ্ধি প্রয়োগ করবে?” (সূরাহ্ আল্-হাজ্জ ঃ ৪৬)

এখানে বিচারবুদ্ধি প্রয়োগ করাকে قلب-এর কাজ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।

তবে قلب-কে এ ব্যাপক অর্থে গ্রহণ করে বলতে হবে, قلب-এর মধ্যে দুই ধরনের জ্ঞান-আহরণ ক্ষমতা নিহিত রয়েছে ঃ একটি হচ্ছে বিচার-বিশ্লেষণ ক্ষমতা, আর অপরটি হচ্ছে সহজাত জ্ঞান, ইন্দ্রিয়লব্ধ তথ্যাদি এবং বিচারবুদ্ধির জ্ঞান ও তথ্যাদি বহির্ভূত তথা পার্থিব কার্যকারণ বহির্ভূত অনুভূতি এবং ওয়াহী ও ইল্‌হাম্ ধারণ করার ক্ষমতা।

আধুনিক জ্ঞানতত্ত্বের ভাষায় এ দু’টি অভ্যন্তরীণ শক্তিকে দু’টি স্বতন্ত্র জ্ঞানমাধ্যম হিসেবে গণ্য করা হয়েছে এবং প্রথমটিকে ‘বিচারবুদ্ধি’ (عقل) নাম দেয়া হয়েছে, আর দ্বিতীয়টিকে অন্তঃকরণ (قلب) নামেই অভিহিত করা হয়েছে। তবে এ কারণে আমাদের প্রতিপাদ্য বিষয় নিয়ে কোনো সমস্যা সৃষ্টি হচ্ছে না। কারণ, কোরআন মজীদে قلب-এর এ উভয় ধরনের ক্ষমতার সপক্ষেই প্রমাণ রয়েছে যার কিছু আমরা ইতিমধ্যেই উল্লেখ করেছি।[১]

---

1 এ প্রসঙ্গে আরো উল্লেখ্য যে, কোরআন মজীদে عقل ক্রিয়ামূল থেকে নিষ্পন্ন বিভিন্ন ক্রিয়াপদ ৪৯ বার ব্যবহৃত হয়েছে, কিন্তু তা একটি স্বতন্ত্র অভ্যন্তরীণ শক্তির নাম হিসেবে ব্যবহৃত হয় নি এবং সম্ভবতঃ তৎকালে আরবী ভাষায় এরূপ ব্যবহার প্রচলিত ছিলো না, বরং قلب-কে এ ক্রিয়াপদের ক্রিয়াসমূহের উৎস হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। অন্যদিকে قلب ক্রিয়ামূল থেকে নিষ্পন্ন ক্রিয়াসমূহের তাৎপর্যের মূল সুর হচ্ছে বিপরীত হওয়া (যেমন ঃ ফিরে আসা, উল্টে যাওয়া ইত্যাদি)। এ সব ক্রিয়াপদের সাথে মানুষের শরীরের ভিতরকার একটি মাংসপি- বা একটি অভ্যন্তরীণ শক্তি হিসেবে قلب বলতে যা বুঝায় তার সাথে এ ক্রিয়াপদগুলোর কোনো সম্পর্ক নেই। বরং অভ্যন্তরীণ শক্তি হিসেবে قلب

অন্তঃকরণের ইন্দ্রিয়নিচয় ঃ

এ প্রসঙ্গে আরো উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, মানুষের মধ্যে অন্তঃকরণ (قلب) নামে যে অবস্তুগত জ্ঞানমাধ্যম রয়েছে বা এ কালের পরিভাষায়, বিচারবুদ্ধি ও অন্তঃকরণ নামে যে শক্তি রয়েছে বস্তুদেহের ইন্দ্রিয়নিচয়ের মতো তারও (অবস্তুগত) ইন্দ্রিয়নিচয় রয়েছে। বস্তুদেহের ইন্দ্রিয়নিচয়ের সাহায্য ছাড়াই মানুষের বিচারবুদ্ধি ও অন্তঃকরণ তার এ সব নিজস্ব ইন্দ্রিয়াদির দ্বারা জ্ঞান আহরণ করতে পারে। অর্থাৎ অন্তঃকরণের শ্রবণ, দর্শন, স্পর্শকরণ, আঘ্রাণ ও স্বাদ গ্রহণের ক্ষমতা আছে। কল্পনার চোখে অনেক দৃশ্য দর্শন করার অভিজ্ঞতা কমবেশী সকলেরই রয়েছে। এমনকি শুধু কল্পনাশক্তির সাহায্যে বস্তুদেহের ইন্দ্রিয়নিচয়ের দ্বারা শ্রবণ, স্পর্শকরণ, আঘ্রাণ ও স্বাদ গ্রহণের অভিজ্ঞতার হুবহু অনুরূপ কিছু কিছু অভিজ্ঞতাও অনেকের থাকতে পারে।

মানুষের বস্তুদেহের ইন্দ্রিয়নিচয়ের বাইরে অন্তঃকরণের ইন্দ্রিয়নিচয় থাকার কথা কোরআন মজীদ থেকেও প্রমাণিত হয়। যেমন, এরশাদ হয়েছে ঃ

□□□□□□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□ □□□□□□□□
□□□□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□

বলতে যা বুঝায় তার ক্রিয়াকা- হচ্ছে عقل ক্রিয়ামূল থেকে নিষ্পন্ন ক্রিয়াপদসমূহ। তাছাড়া মানুষ তার অন্তঃকরণের অনুভূতি ও পথনির্দেশের কারণে চিন্তাভাবনাবিহীন বা প্রবৃত্তিজাত প্রবণতাতাড়িত সিদ্ধান্ত থেকে বিপরীত দিকে ফিরে আসে – এ কারণেও একে قلب বলা হয়ে থাকতে পারে।

"(হে রাসূল!) আপনি কি তাকে দেখেছেন যে তার প্রবৃত্তিকে স্বীয় ইলাহ্ রূপে গ্রহণ করেছে এবং আল্লাহ্ তাকে জ্ঞানের ওপরে গোমরাহ্ করেছেন, আর তার শ্রবণের ও তার অন্তঃকরণের ওপর মোহর করে দিয়েছেন এবং তার দর্শনক্ষমতার ওপর আবরণ তৈরী করে দিয়েছেন?" (সূরাহ্ আল্-জাাছিয়াহ্ ঃ ২৩)

নিঃসন্দেহে এখানে বস্তুদেহের কান ও চোখের কথা বলা হয় নি।

অন্যত্র অধিকতর সুস্পষ্ট ভাষায় এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। এরশাদ হয়েছে ঃ

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

"আর তাদের মধ্যে কতক লোক আছে যারা (হে রাসূল!) আপনার কথা (বস্তুদেহের কান দ্বারা) শোনে; আপনি কি বধিরকে (আপনার কথা) শুনাতে চান যদিও তারা বিচারবুদ্ধি কাজে লাগায় না? আর তাদের মধ্যে কতক লোক আছে যারা আপনার দিকে (বস্তুদেহের চক্ষু দ্বারা) মনোযোগ সহকারেই দৃষ্টিপাত করে; আপনি কি অন্ধকে পথ দেখাতে পারবেন যদিও তারা (অন্তঃকরণের চোখ দ্বারা) দেখতে পায় না?" (সূরাহ্ ইউনুস ঃ ৪২-৪৩)

এখানে সুস্পষ্ট যে, যাদেরকে বধির ও অন্ধ বলা হয়েছে তাদের বস্তুদেহের কান ও চোখ অকেজো নয়।

এ ধরনের আয়াত কোরআন মজীদে আরো আছে।

জ্ঞানের পথে প্রতিবন্ধকতা

বিভিন্ন ধরনের প্রতিবন্ধকতার কারণে মানুষের জ্ঞানমাধ্যম যথাযথভাবে কাজ না-ও করতে পারে। সে ক্ষেত্রে ব্যক্তির পক্ষে ঐ মাধ্যমের সাহায্যে সঠিক জ্ঞান অর্জন করা সম্ভব হয় না।

এ ক্ষেত্রে প্রথমেই সহজাত জ্ঞানের কথা চিন্তা করা যেতে পারে। উল্লেখ্য, সহজাত জ্ঞানের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এমন যে, কোনোরূপ প্রশিক্ষণ ছাড়াই নিজে নিজেই তা ব্যক্তির মধ্যে সঞ্চারিত হয়। অবশ্য এ জন্য একদিকে যেমন ব্যক্তির প্রকৃতি অবিকৃত থাকতে হবে, অন্যদিকে একটি বিশেষ সহজাত জ্ঞান ব্যক্তির মধ্যে সঞ্চারিত হবার জন্য প্রয়োজনীয় শর্তাবলী পূরণ হতে হবে। উদাহরণস্বরূপ, যৌন জ্ঞানের অধিকারী হবার জন্য একটি সুনির্দিষ্ট বয়সে উপনীত হওয়া অপরিহার্য; এর আগে মানবসন্তানের মধ্যে এতদ্বিষয়ক জ্ঞানের উদয় হয় না। কিন্তু কোনো কারণে, যেমন ঃ বয়স হওয়া সত্ত্বেও কোনো শারীরিক বা মানসিক ব্যাধির কারণে কারো মধ্যে যৌনতার জ্ঞানের উদয় না-ও হতে পারে।

ইন্দ্রিয়নিচয়ের দ্বারা আহরণযোগ্য জ্ঞান আহরণের ক্ষেত্রেও শারীরিক বা মানসিক রোগব্যাধি অথবা অঙ্গহানি-অবস্থা বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে। এ বাধার ফলে কোনো জ্ঞান অর্জন করা একেবারেই অসম্ভব হয়ে পড়তে পারে। উদাহরণস্বরূপ, যে ব্যক্তি জন্মান্ধ তার পক্ষে রং সংক্রান্ত জ্ঞান অর্জন করা সম্ভব নয়। তেমনি জন্মবধিরের পক্ষে শব্দ ও সুর সংক্রান্ত জ্ঞান লাভ করা অসম্ভব। অন্যদিকে কারো চোখে এমন ত্রুটি থাকতে পারে যার ফলে সে কোনো কোনো রং-কে বা কোনো কোনো বস্তুর আকারকে বিকৃতরূপে দেখতে পারে এবং তার মনে হতে পারে যে, এ বস্তুগুলোর রং ও আকৃতি ঐরূপই। এ ধরনের ইন্দ্রিয়সম্পর্কিত প্রতিবন্ধকতা সাময়িক বা স্থায়ী হতে পারে। তবে উপযুক্ত চিকিৎসার দ্বারা সাময়িক প্রতিবন্ধকতা দূর করা সম্ভব হতে পারে।

বিচারবুদ্ধি ও অন্তঃকরণের জ্ঞানার্জনের পথে বাধা হিসেবে কাজ করে প্রবৃত্তির তাড়না, প্রেম-ভালোবাসা, হিংসা-বিদ্বেষ, শত্রুতা, ক্রোধ, ঘৃণা ইত্যাদি মানসিক অবস্থা। মানুষের এ সব বৈশিষ্ট্য সুনির্দিষ্ট মাত্রা অতিক্রম করে গেলে তথা অনয়িন্ত্রিত হয়ে নেতিবাচক অবস্থায় উপনীত হলে তা তার বিচারবুদ্ধি ও অন্তঃকরণের জ্ঞানের

পথে সাময়িক বা স্থায়ী প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, ক্রোধের বা ভাবাবেগের সময় কারো কাছে যুক্তিসঙ্গত কথাও অযৌক্তিক বা অগ্রহণযোগ্য বা মিথ্যা মনে হতে পারে। কিন্তু ক্রোধ ও ভাবাবেগ প্রশমিত হবার পর সে ঐ কথাটির যৌক্তিকতা বুঝতে পারে।

তেমনি অন্ধ ভালোবাসার কারণে কারো কাছে কোনো ব্যক্তিকে সমস্ত রকমের দোষক্রটির উর্ধে অনুপম সুন্দর বা অতুলনীয় গুণাবলীসম্পন্ন বলে মনে হতে পারে। কিন্তু পরে স্বাভাবিকভাবেই তার ভালোবাসার তীব্রতা বা উচ্ছ্বাস হ্রাস পেয়ে বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গির ওপর থেকে প্রতিবন্ধকতা দূরীভূত হয়ে তার কাছে ঐ ব্যক্তির দোষক্রটিগুলো ধরা পড়তে পারে। অন্যদিকে অন্ধ ঘৃণা-বিদ্বেষের কারণে কারো কাছে এক ব্যক্তিকে সব রকমের উত্তম গুণ থেকে বঞ্চিত জঘন্যতম ব্যক্তি বলে মনে হতে পারে। কিন্তু কালের প্রবাহে তার ঘৃণা-বিদ্বেষের তীব্রতা হ্রাস পাবার পর সে ঐ ব্যক্তির মধ্যে কিছু ভালো গুণও লক্ষ্য করতে পারে।

কিন্তু বিচারবুদ্ধি ও অন্তঃকরণের পথে সৃষ্ট প্রতিবন্ধকতা ক্ষেত্রবিশেষে এমন তীব্র হতে পারে যে, তা অপসারিত হবার সম্ভাবনা পুরোপুরি তিরোহিত হয়ে যেতে পারে। তেমনি প্রতিবন্ধকতামূলক কাজের বার বার পুনরাবৃত্তির ফলে তা ব্যক্তির স্থায়ী অভ্যাসে পরিণত হয়ে যেতে পারে। সে ক্ষেত্রে এ প্রতিবন্ধকতা আর অপসারিত হবার সম্ভাবনা থাকে না, বরং স্থায়ী রূপ ধারণ করে। দার্শনিক পরিভাষায় একে “মালাকাহ্” (ملكة) বলা হয়। এরূপ অবস্থায় ব্যক্তি একটি ঘৃণ্য কাজেও আনন্দ লাভ করতে পারে। শুধু তা-ই নয়, এ কাজটি তার কাছে আদৌ ঘৃণ্য মনে না-ও হতে পারে। উদাহরণস্বরূপ একজন পাগলের আচরণের কথা বলা যায়। যেমন ঃ একজন পাগল পাগলামির মধ্যে আনন্দ পেতে পারে, বা ধরুন, নির্দ্বিধায় নিজের গায়ে পায়খানা মাখাতে পারে। বিকৃতরুচি লোকদের অবস্থাও

অনুরূপ। রুচিবিকৃতির কারণে একজন মানুষ সর্বসমক্ষে অর্ধনগ্ন হতে পারে; এমনকি কেউ কেউ পুরোপুরি নগ্নও হতে পারে।

প্রাকৃতিক জগত থেকে উদাহরণের সাহায্যেও বিষয়টি বুঝা যেতে পারে। যেমন ঃ কোনো কোনো গাছ গোড়া থেকে কেটে ফেললে গোড়ার যে অংশ মাটির নীচে থাকে তা থেকে নতুন করে গাছ গজায়। কিন্তু নতুন গজানো গাছ যদি বড় হওয়ার আগেই কেটে বা ভেঙ্গে ফেলা হয় এবং এভাবে পুনরাবৃত্তি চলতে থাকে তাহলে এমন একটা সময় আসে যখন আর ঐ গোড়া থেকে নতুন গাছ গজায় না অর্থাৎ গোড়াটি মরে যায়। তেমনি অব্যবহারের কারণে একটি ছুরিতে মরিচা পড়লে প্রাথমিক অবস্থায় রেত দিয়ে ঘষে তার মরিচা দূর করা যায় এবং এভাবে ছুরিটি পুনরায় ব্যবহারের উপযোগী হয়ে ওঠে। আর বেশী মরিচা ধরলে অর্থাৎ মরিচা ধরা শুরু হওয়ার পর অনেক দিন ছুরিটি একই অবস্থায় পড়ে থাকলে আগুনে পুড়িয়ে মরিচার পুরু স্তর ফেলে দিয়ে এরপর রেত দিয়ে ঘষে সেটিকে ব্যবহারোপযোগী করা যায়। কিন্তু অনেক বেশীদিন পড়ে থাকার ফলে ছুরিটির পুরো ফলাই যদি মরিচায় পরিণত হয়ে যায় তাহলে অতঃপর আর তা ব্যবহারের উপায় থাকে না।

কোরআন মজীদের বিভিন্ন আয়াতে ক্বাল্‌বের অসুস্থতার কথা বলা হয়েছে। যেমন, মুনাফিকদের সম্পর্কে এরশাদ হয়েছে ঃ

فى قلوبهم مرض

"তাদের অন্তঃকরণে ব্যাধি আছে।" (সূরাহ্ আল্-বাক্বারাহ্ ঃ ১০)

অন্তর অসুস্থ হলে তার পক্ষে যে অনেক সহজ বিষয়ও অনুধাবন করা সম্ভব হয় না সে কথাও বলা হয়েছে। দোযখের ফেরেশতা-সংখ্যা মাত্র ১৯ জন; এ সংখ্যাটিকে কাফেরদের জন্য একটি পরীক্ষাস্বরূপ করার কথা উল্লেখের পর আল্লাহ্ তা'আলা এরশাদ করেন ঃ

و ليقول الذين فى قلوبهم مرض و الكافرون ما ذا اراد الله بهذا مثلاً.

"যাতে যাদের অন্তরে ব্যাধি আছে তারা এবং কাফেররা বলে যে, আল্লাহ্ এ উপমা দ্বারা কী বুঝাতে চাচ্ছেন?" (সূরাহ্ আল্-মুদ্দাছ্ছির ঃ ৩১)

কোরআন মজীদের অন্য এক আয়াতে অন্তরের বক্রতার কথাও উল্লেখ করা হয়েছে; বলা হয়েছে ঃ الذين فى قلوبهم زيغ – "যাদের অন্তঃকরণসমূহে বক্রতা রয়েছে।" (সূরাহ্ আালে 'ইমরাান ঃ ৭)

এছাড়া অন্তরে মোহর মেরে দেয়ার কথাও বলা হয়েছে; যেমন, এরশাদ হয়েছে ঃ

ختم الله على قلوبهم و على سمعهم و على ابصارهم غشاوة.

"আল্লাহ্ তাদের (কাফেরদের) অন্তরসমূহের ওপর ও তাদের শ্রবণশক্তির ওপর মোহর মেরে দিয়েছেন এবং তাদের দর্শনশক্তির ওপর আবরণ রয়েছে।" (সূরাহ্ আল্-বাক্বারাহ্ ঃ ৭)[১]

---

1 এখানে লক্ষণীয় যে, উপরোক্ত আয়াতে অন্তরের ওপর মোহর মেরে দেয়ার কথা বলা হয়েছে যা থেকে সুস্পষ্ট যে, তাদের বস্তুদেহের হৃদপি- অকেজো হয়ে পড়ার কথা বলা হয় নি। কারণ, তাহলে তো মানুষ মরেই যায়, আর মৃত মানুষের প্রসঙ্গে সত্য গ্রহণ করা-নাকরার কথা আসে না। বরং এখানে তাদের হৃদয়ঙ্গমক্ষমতা বিনষ্ট হয়ে যাবার কথা বলা হয়েছে। অন্যদিকে এতে তাদের বস্তুদেহের শ্রবণ ও দর্শন ক্ষমতা নষ্ট হওয়ার কথা বলা হয় নি। কারণ, এরূপ ব্যক্তিকে সত্যের দাও'আত গ্রহণ না করার জন্য দোষারোপ করা চলে না। তাছাড়া বস্তুদেহের কান ও চোখ বুঝাতে চাইলে على سمعهم (তাদের শ্রবণশক্তির ওপর) না বলে على آذانهم (তাদের > < কানের ওপর) এবং على ابصارهم (তাদের দর্শনশক্তির ওপর) না বলে على عيونهم (তাদের চোখের ওপর) বলা হতো। অবশ্য 'কান' ও 'চোখ' শব্দ দু'টির দ্বারা সকল ভাষায়ই বস্তুদেহের দু'টি অঙ্গবিশেষ বুঝানোর পাশাপাশি বস্তুদেহের শ্রবণশক্তি ও দর্শনশক্তি

মানুষের এ অবস্থার জন্য অবশ্য সে নিজেই দায়ী। অন্তঃকরণ ও বিচারবুদ্ধির অনুধাবনক্ষমতার পথে সৃষ্ট প্রতিবন্ধকতা যে মানুষের নিজেরই সৃষ্ট কোরআন মজীদের বিভিন্ন আয়াতে তা উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন, এরশাদ হয়েছে ঃ

ارءيت من اتخذ الهه هواه. افانت تكون عليه وكيبلاً. ام تحسب ان اكثرهم يسمعون او يعقلون. ان هم الا كالانعام بل هم اضل سبيلاً.

"(হে রাসূল!) আপনি কি তাকে দেখেছেন যে তার প্রবৃত্তিকে ইলাহ্ হিসেবে গ্রহণ করেছে? এরপরও কি আপনি তার যিম্মাদার হবেন? আপনি কি মনে করেন যে, তাদের বেশীরভাগ লোকই (মনোযোগ দিয়ে/ শোনার মতো করে) শোনে, অথবা (শুনলেও) বিচারবুদ্ধি কাজে লাগায়? তারা তো পশু ছাড়া কিছু নয়; বরং পথ বেছে নেয়ার ক্ষেত্রে অধিকতর বিচ্যুত।" (সূরাহ্ আল্-ফুর্ক্বান্ ঃ ৪৩-৪৪)

কোরআন মজীদের দৃষ্টিতে পূর্বপুরুষদের অন্ধ অনুসরণের প্রবণতাও জ্ঞানের পথে অন্যতম বড় বাধা। যেমন, এরশাদ হয়েছে ঃ

واذا قيل لهم اتبعوا ما انزل الله قالوا بل نتبع ما الفينا عليه اباءنا. اوا لو كان اباءهم لا يعقلون شيئاً و لا يهتدون. و مثل الذين كفروا كمثل الذى

এবং এমনকি ক্ষেত্রবিশেষে অন্তরের শ্রবণ ও দর্শনশক্তি তথা মনোযোগ প্রদান ও অনুধাবন করা অর্থেও ব্যবহৃত হয়। কিন্তু 'শ্রবণ' ও 'দর্শন' তথা 'শ্রবণশক্তি' ও 'দর্শনশক্তি' বলতে শারীরিক অঙ্গ বুঝায় না, বরং শরীরের 'শ্রবণ' ও 'দর্শন' ক্ষমতা বা অন্তরের অনুধাবন ক্ষমতাকে বুঝানো হয়। আর উদ্ধৃত আয়াতে তা দ্বারা অন্তরের অনুধাবনক্ষমতাকেই বুঝানো হয়েছে, কারণ, শারীরিক শ্রবণ ও দর্শন শক্তিকে বিনষ্ট করতে হলে এ দু'টি 'শক্তি'র ওপর মোহর মারা ও আবরণ দেয়া সম্ভব নয়, বরং সে জন্য বস্তুদেহের অঙ্গ দু'টির ওপরই মোহর মারা ও আবরণ দেয়া অপরিহার্য। অতএব, উদ্ধৃত আয়াতে যে কেবল হৃদয়ঙ্গমক্ষমতাকে বুঝানো হয়েছে তাতে সন্দেহের বিন্দুমাত্র অবকাশ নেই।

ينعق بما لا يسمع الا دعاء و نداء. صم بكم عمي فهم لا يعقلون.

“তাদেরকে যখন বলা হয় যে, আল্লাহ্ যা নাযিল করেছেন তার অনুসরণ করো, তখন তারা বলে ঃ “আমরা তো তারই অনুসরণ করবো যার ওপরে আমাদের বাপ-দাদাদের পেয়েছি।” তাদের বাপ-দাদারা যদি কোনো বিষয়ে বিচারবুদ্ধি প্রয়োগ না করে থাকে এবং সঠিক পথ প্রাপ্ত না হয়ে থাকে তবুও (কি তারা তাদের বাপ-দাদাদের অনুসরণ করবে)? আর (এ ধরনের) কাফেরদের উপমা হচ্ছে এরূপ যে, যেন কোনো ব্যক্তি এমন কোনো জীবকে আহ্বান করছে যে হাঁকডাক ও চীৎকার ছাড়া আর কিছুই শুনতে পায় না (তাৎপর্য বুঝতে পারে না)। তারা বোবা, বধির ও অন্ধ, অতএব, তারা বিচারবুদ্ধি প্রয়োগ করবে না।” (সূরাহ্ আল্-বাক্বারাহ্ ঃ ১৭০-১৭১)

আল্লাহ্ তা‘আলা যুলম-অত্যাচারকে সঠিক পথ প্রাপ্তির সম্ভাবনা স্থায়ীভাবে রুদ্ধ হয়ে যাওয়ার অন্যতম কারণ হিসেবে উল্লেখ করেছেন। এরশাদ হয়েছে ঃ

و يضل الله الظالمين.

“আর আল্লাহ্ যালেমদেরকে পথভ্রষ্ট করে দেন।” (সূরাহ্ ইবরাহীম ঃ ২৭)

و من يضل الله فما له من سبيل.

“আর আল্লাহ্ যাকে পথভ্রষ্ট করেন তার জন্য (সত্যে উপনীত হওয়ার) কোনো পথই নেই।” (সূরাহ্ আশ্-শূরা ঃ ৪৬)

এছাড়া পাপাচারে গভীরভাবে নিমজ্জিত হয়ে যাওয়াও সত্যে বা সঠিক জ্ঞানে উপনীত হবার পথকে রুদ্ধ করে দেয়। আল্লাহ্ তা‘আলা এরশাদ করেন ঃ

و ما يضل به الا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه و يقطعون ما امر الله به ان يصل و يفسدون فى الارض.

"আর তিনি এর (মশা-মাছির উপমা) দ্বারা সেই পাপাচারীদের ব্যতীত কাউকে পথভ্রষ্ট করেন না যারা আল্লাহ্‌র সাথে অঙ্গীকারাবদ্ধ হবার পর তা লঙ্ঘন করে এবং আল্লাহ্ যা যুক্ত রাখার নির্দেশ দিয়েছেন তা বিচ্ছিন্ন করে, আর ধরণীর বুকে পাপাচার ও বিশৃঙ্খলা-বিপর্যয় সৃষ্টি করে।" (সূরাহ্ আল্-বাক্বারাহ্ ঃ ২৬)

জ্ঞানের পথে স্থায়ী প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির আরো কতক কারণ রয়েছে। এর মধ্যে নবী-রাসূলগণের ('আঃ) উদ্দেশে ঠাট্টা-বিদ্রুপ অন্যতম (সূরাহ্ আল্-ফুর্ক্বান্ ঃ ৪০-৪৪)।

বস্তুতঃ নিজেদের অনুসৃত কর্মনীতি বা কৃতকর্মের ফলে যাদের জন্য সঠিক জ্ঞানে বা সঠিক পথে উপনীত হবার সম্ভাবনা চিরতরে বিনষ্ট হয়ে গেছে এরূপ লোকদের সম্বন্ধেই আল্লাহ্ তা'আলা এরশাদ করেছেন ঃ

ان الذين كفروا سواء عليهم ء انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون.

"নিঃসন্দেহে যারা কুফরী করেছে, (হে রাসূল!) আপনি তাদেরকে সতর্ক করে থাকুন বা না করে থাকুন (উভয়ই) তাদের জন্য সমান; অতএব, তারা ঈমান আনয়ন করবে না।" (সূরাহ্ আল্-বাক্বারাহ্ ঃ ৬)

তবে জ্ঞানের পথে বিরাজমান অস্থায়ী বা সাময়িক প্রতিবন্ধকতা বিভিন্ন পন্থায় অপসারণ করা সম্ভব। প্রতিবন্ধকতা প্রাথমিক পর্যায়ে থাকলে যথোপযুক্ত ব্যক্তিদের সাহচর্য ও উপদেশ বা যথাযথ গ্রন্থাবলী অধ্যয়নের ফলে দূরীভূত হতে পারে। কিন্তু প্রতিবন্ধকতা খুবই দৃঢ়মূল হয়ে গেলে (কিন্তু স্থায়ী হয়ে না গিয়ে থাকলে) বিপদাপদ ও বালা-মুছ্বীবতের ফলে তা দূরীভূত হতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, কোনো লোহায় অল্পস্বল্প মরিচা পড়লে রেত দ্বারা ঘষে তা দূর করা যেতে পারে। কিন্তু মরিচার মাত্রা খুব বেশী হলে আগুনে পোড়ানো ছাড়া গত্যন্তর থাকে না। সুতরাং বিপদাপদ ও বালা-মুছ্বীবত যখন কারো সঠিক জ্ঞানে উপনীত হওয়ার পথ থেকে

প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণে ও তার চক্ষু উন্মীলনে সহায়ক হয় তখন কার্যতঃ সে বালা-মুছিবত তার জন্য আল্লাহ্ তা'আলার রহমত স্বরূপ।

জ্ঞানমাধ্যম ও জ্ঞানসূত্রের গ্রহণযোগ্যতার ক্রমবিন্যাশ

অনেক ক্ষেত্রে বিভিন্ন জ্ঞানমাধ্যম ও জ্ঞানসূত্র থেকে প্রাপ্ত তথ্যাদির মধ্যে সাংঘর্ষিক অবস্থার সৃষ্টি হয়। এমতাবস্থায় জ্ঞানমাধ্যম ও জ্ঞানসূত্র সমূহের মধ্যে অগ্রাধিকারভিত্তিক ক্রমবিন্যাস নির্ণয় করা অপরিহার্য। আর এটা করতে হলে বিভিন্ন জ্ঞানমাধ্যম ও জ্ঞানসূত্রের শক্তিশালী ও দুর্বল দিকের প্রতি দৃষ্টি দেয়া অপরিহার্য।

এ ক্ষেত্রে প্রথমেই আসে সহজাত জ্ঞানের কথা। সহজাত জ্ঞান যেহেতু সর্বজনীন এবং তা যথাসময়ে মানুষের ভিতর থেকেই উৎসারিত হয় সেহেতু এ ধরনের জ্ঞানের সাথে অন্য কোনো জ্ঞানমাধ্যম বা জ্ঞানসূত্র থেকে প্রাপ্ত জ্ঞানের সাংঘর্ষিকতা দেখা দেয়ার সম্ভাবনা নেই বললেই চলে; ক্ষেত্রবিশেষে সাংঘর্ষিকতা দেখা দিলেও সহজাত জ্ঞান স্বয়ং অন্য জ্ঞানকে বাতিল করে দেয়। তাই সহজাত জ্ঞানকে আমাদের এ আলোচনার বাইরে রাখতে হবে এবং অন্যান্য জ্ঞানমাধ্যম ও জ্ঞানসূত্রের ভিতরেই পারস্পরিক অগ্রাধিকার বিবেচনা করতে হবে।

আমরা জানি যে, বিচারবুদ্ধি হচ্ছে স্বয়ং জ্ঞানমাধ্যম ও একই সাথে জ্ঞানের উৎসও বটে। অন্যদিকে তা অপরাপর জ্ঞানমাধ্যম ও জ্ঞানসূত্র থেকে প্রাপ্ত জ্ঞান ও তথ্যাদির পর্যালোচনাকারী বা বিচারক। অবশ্য এ ভূমিকা পালনের জন্য বিচারবুদ্ধির সুস্থ ও অবিকৃত থাকা অপরিহার্য। তবে বিচারবুদ্ধি অসুস্থ বা বিকৃত হয়ে পড়লে তা বিচারবুদ্ধির কাছেই ধরা পড়ে। এমনকি কোনো ব্যক্তির বিচারবুদ্ধি স্বীয় অসুস্থতা ও বিকৃতি সম্পর্কে সচেতন না থাকলেও অন্যদের বিচারবুদ্ধির কাছে তা ধরা পড়তে বাধ্য। তেমনি প্রয়োজনীয় কোনো তথ্যের অভাবে বা অন্য জ্ঞানমাধ্যম ও জ্ঞানসূত্র থেকে ভুল তথ্য

পাওয়ার কারণে বিচারবুদ্ধি তার উপসংহারে ভুল করতে পারে। তবে স্বয়ং বিচারবুদ্ধিই বিচারবুদ্ধির ভুল চিহ্নিত করতে পারে। হতে পারে যে, যে বিচারবুদ্ধি ভুল সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে সে তার নিজের ভুল বুঝতে পারছে না। কিন্তু অন্যদের বিচারবুদ্ধি তার ভুল ধরিয়ে দিলে তখন সে ঠিকই তা বুঝতে পারে।

আমরা ইতিপূর্বে যেমন উল্লেখ করেছি, ইন্দ্রিয়নিচয় স্রেফ তথ্য সংগ্রহ করে মাত্র; এ সব তথ্যকে জ্ঞান বলা চলে না। অধিকন্তু তা ভুল তথ্যও সরবরাহ করে থাকে। তাই ইন্দ্রিয়নিচয় কর্তৃক সংগৃহীত তথ্য কেবল বিচারবুদ্ধির দ্বারা পরীক্ষা-নিরীক্ষা সাপেক্ষেই গ্রহণযোগ্য।

মানুষের অন্তঃকরণে যে সব তথ্যের উদয় হয় তা-ও বিচারবুদ্ধি কর্তৃক পরীক্ষা-নিরীক্ষা সাপেক্ষে গ্রহণযোগ্য। কারণ, অন্তঃকরণে উদিত হওয়া তথ্যাদি বিভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে এবং তার মধ্যে কোনো কোনো তথ্যে অস্পষ্টতা থাকতে পারে বা ব্যক্তি তা সঠিকভাবে বোঝার ক্ষেত্রে ভুল করতে পারে। শুধু তা-ই নয়, কারো অন্তরে সম্পূর্ণরূপে বিভ্রান্তিকর তথ্যও উদয় হতে পারে। কোরআন মজীদে সুস্পষ্ট ভাষায় এ বিষয়ে উল্লেখ করা হয়েছে। এরশাদ হয়েছে ঃ

و ان الشياطين ليوحون الى اوليائهم ليجادلوكم. و ان اطعتموهم انكم لمشركون.

“আর অবশ্যই শয়তানরা তাদের বন্ধুদেরকে প্রত্যাদেশ (ওয়াহী) করে যাতে তারা তোমাদের সাথে বিতর্ক করে (তোমাদেরকে বিভ্রান্ত করার জন্য ধূর্ততার সাথে কূটতর্ক করতে সক্ষম হয়)। তোমরা যদি তাদের আনুগত্য করো তাহলে অবশ্যই তোমরা মুশরিক হয়ে যাবে।” (সূরাহ্ আল্-আন্‘আম্ ঃ ১২১)

এ থেকে সুস্পষ্ট যে, শয়তান মানুষের অন্তঃকরণে বিভ্রান্তিকর ভাব ও ধারণা সৃষ্টি করে দিতে পারে। এমনকি সে সব ভাব ও ধারণা বাহ্যতঃ উত্তম ও খুবই গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে।

উদাহরণস্বরূপ, শয়তান কারো অন্তঃকরণে খত্মে নবুওয়াত্ সম্পর্কে কূট ব্যাখ্যা সহ এ মর্মে প্রত্যাদেশ করতে পারে যে, তোমাকে নবীরূপে মনোনীত করা হলো। কোরআন মজীদ ও বিচারবুদ্ধির দৃষ্টিতে যেখানে নবুওয়াতের ধারাবাহিকতা শেষ হয়ে গেছে সেখানে অন্তঃকরণে জাগ্রত এরূপ ধারণাকে অবশ্যই বিচারবুদ্ধির কাঠগড়ায় দাঁড় করাতে হবে। বিচারবুদ্ধি যখন রায় দেয় যে, পূর্ণাঙ্গ বিধান ও কিতাব নাযিল হওয়া ও সংরক্ষিত থাকার পরে আর নতুন কোনো নবীর অভিষিক্ত হওয়া সম্ভব নয়, তখন নিঃসন্দেহে অন্তঃকরণে জাগ্রত এ ধারণাটি শয়তানের পক্ষ থেকে প্রত্যাদেশ করা হয়েছে।

মোদ্দা কথা, অন্তঃকরণে জাগ্রত তথ্যাদি কেবল তখনি গ্রহণযোগ্য হতে পারে যখন বিচারবুদ্ধির মানদ- তা গ্রহণযোগ্য বলে প্রমাণিত হয়।

দ্বিতীয়তঃ অন্তঃকরণে জাগ্রত জ্ঞান নিজে নিজে কখনোই সর্বজনীনতার অধিকারী হতে পারে না। অন্তঃকরণে জাগ্রত সত্য ধারণা – বিচারবুদ্ধির পর্যালোচনায় যা টিকে যায়, এমনকি তা নবুওয়াত-সংশ্লিষ্ট ওয়াহী হলেও, তা যার অন্তঃকরণে জাগ্রত হয় তার জন্য অকাট্য দলীল বটে, কিন্তু অন্যদের জন্য তা অকাট্য দলীল নয়। অন্যদের জন্য তা অকাট্য দলীল হওয়ার বিষয়টি পুরোপুরিভাবে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হওয়ার ওপর নির্ভরশীল। অর্থাৎ লোকেরা তাদের বিচারবুদ্ধি দ্বারা ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে পর্যালোচনা করে যদি তাঁর সত্যবাদিতার ব্যাপারে অকাট্য প্রত্যয়ে উপনীত হতে পারে তখন তাঁর প্রত্যাদেশপ্রাপ্তি সম্পর্কেও প্রত্যয়ের অধিকারী হবে এবং তিনি যে প্রত্যাদেশ পেয়েছেন তার ওপরও তাদের প্রত্যয় উৎপাদিত হবে, ফলে তা থেকে তাদের জন্য জ্ঞান অর্জিত হবে।

অতএব, আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, অন্তঃকরণে উদিত তথ্য বা জ্ঞানের গ্রহণযোগ্যতা বিচারবুদ্ধির রায়ের ওপর নির্ভরশীল। আর বিচারবুদ্ধি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির ওপর আস্থার ব্যাপারে ইতিবাচক রায় প্রদান করে বিধায় তার কথাকে অন্যরা অন্ধভাবে সত্য বলে মেনে

নেয়। অর্থাৎ অন্তঃকরণে উদিত তথ্য বা জ্ঞান যার অন্তঃকরণে তা উদিত হয়েছে তার জন্য ‘অন্তঃকরণে উদিত তথ্য বা জ্ঞান’ হলেও অন্যদের জন্য তা ‘বিচারবুদ্ধির সমর্থনক্রমে অন্ধভাবে গৃহীত তথ্য বা জ্ঞান’ মাত্র।

বস্তুতঃ সমস্ত রকমের উদ্ধৃতিযোগ্য জ্ঞানই এ পর্যায়ের। অর্থাৎ যার কাছ থেকে জ্ঞান লাভ হবে বিচারবুদ্ধি তার গ্রহণযোগ্যতার অনুকূলে রায় দিলে কেবল তখনই অন্য ব্যক্তির নিকট তা গ্রহণযোগ্য হবে এবং তা থেকে জ্ঞান অর্জিত হবে। আর অন্তঃকরণের জ্ঞানের অধিকারী ব্যক্তির গ্রহণযোগ্যতার অনুকূলে বিচারবুদ্ধির রায়দানের বিষয়টি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির পরিচয় তথা তার সাথে সম্পর্কিত তথ্যাদি যথাযথভাবে অন্যদের কাছে পৌঁছার ওপর নির্ভরশীল। নচেৎ বিচারবুদ্ধি তার দাবীকে সত্য বলে গ্রহণ না-ও করতে পারে। এ কারণেই এমনকি নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে বিচার করা সত্ত্বেও একই ব্যক্তিকে কারো বিচারবুদ্ধি নির্ভরযোগ্য মনে করতে পারে এবং কারো বিচারবুদ্ধি অনির্ভরযোগ্য বলে রায় দিতে পারে।

এখানে প্রসঙ্গতঃ ‘প্রত্যয়’ সম্পর্কেও আলোকপাত করা প্রয়োজন। কোরআন মজীদেও ‘প্রত্যয়’ (يقين) পরিভাষা ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু সাধারণভাবে এ পরিভাষাটি যে অর্থে ব্যবহৃত হয় তা কোরআন মজীদে ব্যবহৃত অর্থ থেকে স্বতন্ত্র। কোরআন মজীদে ‘প্রত্যয়’ (يقين) পরিভাষাটি ‘সুদৃঢ় ও অকাট্য জ্ঞান’ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যুক্তিবিজ্ঞানের ভাষায় ‘সত্যায়ন’ (تصديق) বলতে যা বুঝায় তারই দৃঢ় রূপ হচ্ছে ‘প্রত্যয়’ পরিভাষা।

কিন্তু যুক্তিবিজ্ঞানের ভাষায় কোনো বিষয়ে কারো মনে ‘প্রত্যয়’ থাকার মানে এ নয় যে, অবশ্যই তা সত্য হবে, ঠিক যেভাবে কেউ কোনো তথ্যকে ‘সত্যায়ন’ করলেই তার সত্যতা অভ্রান্ত নয়। কারণ, একই তথ্যের ব্যাপারে কেউ ‘প্রত্যয়’ (يقين) পোষণ করতে পারে, কেউ ‘ধারণা’ বা ‘বিশ্বাস’ (ظن) পোষণ করতে পারে এবং কেউ ‘সন্দেহ’ (شک) পোষণ করতে পারে। তেমনি একই বিষয়কে

কেউ সত্যায়ন করতে পারে এবং কেউ না-ও করতে পারে। আর বলা বাহুল্য যে, একই বিষয়ে পরস্পরের সাথে সাংঘর্ষিক দুই বা তিনটি মত সঠিক হতে পারে না। অতএব, সন্দেহ নেই যে, কোনো বিষয়ে কোনো ব্যক্তি ভ্রান্ত তথ্যের ওপরেও প্রত্যয় পোষণ করতে পারে, এমনকি কোনোরূপ বাছবিচার, চিন্তা-ভাবনা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা না করেই অন্ধ বিশ্বাসের বশবর্তী হয়েও প্রত্যয় পোষণ করতে পারে। আর অন্ধ প্রত্যয় মিথ্যাকে সত্যে ও ভুলকে সঠিকে পরিণত করতে পারে না।

অতএব, 'প্রত্যয়' (يقين) পরিভাষাটি কোরআন মজীদে যে অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে তার বাইরে প্রচলিত অর্থে বা যুক্তিবিজ্ঞানের ভাষায় ব্যবহৃত 'প্রত্যয়'-এর যথার্থতা নিশ্চিত নয়, ফলে তা থেকে যথার্থ জ্ঞান হাসিল হবার বিষয়টিও নিশ্চিত নয়। বিচারবুদ্ধির মানদণ্ডে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে যে ধারণার যথার্থতা সম্বন্ধে নিশ্চিত হওয়া যাবে কেবল সে ব্যাপারেই 'প্রত্যয়' জ্ঞানের পর্যায়ভুক্ত।

অনেকে যুক্তিবিজ্ঞানের 'সত্যায়ন' (تصديق) পরিভাষা থেকে বিভ্রান্ত হন। আসলে 'সত্যায়ন' (تصديق) বলতে এটাই বোঝা যায় যে, ব্যক্তি একটি তথ্য বা ধারণাকে সত্য বলে মনে করছে; এ থেকে এটা বুঝায় না যে, অবশ্যই তা সত্য হবে। কারণ, ব্যক্তি ভুল তথ্যকে সত্য মনে করতে অর্থাৎ 'সত্যায়ন' করতে পারে – যার দৃঢ়তর মানসিক পর্যায় হচ্ছে 'প্রত্যয়'। অতএব, 'সত্যায়ন' অনিবার্যভাবেই সত্য হওয়ার তথা প্রকৃত জ্ঞান উৎপাদক হওয়ার পরিচায়ক নয়। বরং কোনো কিছু বিচারবুদ্ধির বিশ্লেষণে সত্য প্রমাণিত হওয়াই সত্য হওয়ার তথা জ্ঞানোৎপাদক হওয়ার পরিচায়ক।

বিচারবুদ্ধি ও ইসলাম[১]

বিচারবুদ্ধি (عقل)-এর বিচরণক্ষেত্রের সীমা নিয়ে যথাযথভাবে চিন্তা না করার ফলে প্রায় সকল সমাজেই বিচারবুদ্ধির গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে বিতর্কের সৃষ্টি ও এ ব্যাপারে প্রান্তিক দৃষ্টিকোণের উদ্ভব হয়েছে। অনেকে মানুষের জীবনপথে চলার জন্যে বিচারবুদ্ধির পথনির্দেশকেই যথেষ্ট গণ্য করেছেন এবং পুরোপুরিভাবে এর ওপর নির্ভর করার পক্ষে রায় দিয়েছেন। আবার অনেকে বিচারবুদ্ধির গ্রহণযোগ্যতাকে পুরোপুরি অস্বীকার করেছেন। দুর্ভাগ্যজনক যে, কতক ইসলামী মনীষী বিচারবুদ্ধি ও তার হাতিয়ার যুক্তিপ্রয়োগের বিরোধিতা করায় মুসলিম দ্বীনী সমাজে তাত্ত্বিক ক্ষেত্রে বিচারবুদ্ধি ও যুক্তির প্রতি নেতিবাচক মনোভাব প্রাধান্য লাভ করেছে এবং অন্ধবিশ্বাসের ব্যাপক বিস্তার ঘটেছে, যদিও কার্যক্ষেত্রে সকলেই কমবেশী বিচারবুদ্ধি ও যুক্তির আশ্রয় গ্রহণ করছে। পরিহাসের ব্যাপার হলো এই যে, যারা বিচারবুদ্ধি ও তার হাতিয়ার যুক্তিপ্রয়োগের গ্রহণযোগ্যতা প্রত্যাখ্যান করছেন তা তাঁরা করছেন বিচারবুদ্ধিরই আশ্রয় নিয়ে এবং বহু রকমের যুক্তি প্রদর্শন করে।

অন্যদিকে কতক মনীষী বিচারবুদ্ধিবাদীদের (عقليون) কঠোর সমালোচনা করেছেন ও তাঁদেরকে প্রত্যাখ্যান করেছেন, অথচ তাঁরা নিজেরাও বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিচারবুদ্ধির আশ্রয় নিয়েছেন। কিন্তু তাঁদের

---

1 অত্র গ্রন্থের 'কোরআন মজীদের দৃষ্টিতে জ্ঞানমাধ্যম' অধ্যায়ে মহাগ্রন্থ কোরআনে বিচারবুদ্ধি সম্পর্কে উল্লেখ ও তার ওপর গুরুত্ব আরোপের বিষয়ে সামান্য আভাস দেয়া হয়েছে মাত্র। বিষয়টির বিশেষ গুরুত্বের কারণে এখানে অত্র অধ্যায়টি সন্নিবেশিত করা হলো – যা মূলতঃ আমার লেখা অপ্রকাশিত গ্রন্থ 'জীবন জিজ্ঞাসা' থেকে গৃহীত হয়েছে।

অনুসারীদের ও পরবর্তীদের অনেকে বিষয়টি সম্পর্কে তলিয়ে চিন্তা না করে তাঁরা নিরঙ্কুশভাবেই বিচারবুদ্ধিকে প্রত্যাখ্যান করেছেন বলে মনে করে তাঁদের প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধাবশতঃ বিচারবুদ্ধি প্রত্যাখ্যানের সপক্ষে অবস্থান গ্রহণ করেছেন। অথচ প্রকৃত ব্যাপার হলো, এ ধরনের মনীষীগণের সমালোচনা ও প্রত্যাখ্যানের লক্ষ্য স্বয়ং বিচারবুদ্ধি ও যুক্তিপ্রয়োগ নয়, বরং যারা জীবন ও জগতের অন্তরালে নিহিত মহাসত্য উদ্ঘাটন এবং সঠিক পথ ও পথনির্দেশ উদ্ঘাটনের জন্য একমাত্র বিচারবুদ্ধির ফয়সালাকেই যথেষ্ট গণ্য করেন এবং মানুষকে ওয়াহী ও নবুওয়াত থেকে বেনিয়ায মনে করেন সেই বিচারবুদ্ধিবাদীগণ (عقليون) ও যুক্তিবাদীগণই হচ্ছেন উপরোক্ত মনীষীদের সমালোচনা ও প্রত্যাখ্যানের লক্ষ্য।

'আক্বল্ (عقل) বা বিচারবুদ্ধি প্রশ্নে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও মৌলিক সমস্যা এটাই।

এ ব্যাপারে দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাটি প্রায়োগিক ক্ষেত্রের সাথে সম্পৃক্ত। তা হচ্ছে, যারা বিচারবুদ্ধির অনুসরণের পক্ষপাতী তাঁরা অনেক ক্ষেত্রে একটি উপসংহারকে বিচারবুদ্ধির ফয়সালা বলে দাবী করেন অথচ প্রকৃত পক্ষে তা হয়তো বিচারবুদ্ধির ফয়সালা নয়। কারণ, বিচারবুদ্ধি যতোক্ষণ কোনো বিষয়ে অকাট্য ও অভ্রান্ত উপসংহারে উপনীত হতে না পারে, বরং তাতে কিছুটা সংশয়, বা অনিশ্চয়তা, বা দুর্বলতা থেকে যায়, ততোক্ষণ ঐ উপসংহারকে বিচারবুদ্ধির ফয়সালা বলা যেতে পারে না। কিন্তু কার্যতঃ দেখা যায় যে, দু'জন দার্শনিক বিচারবুদ্ধির ফয়সালার নামে একই বিষয়ে পরস্পরবিরোধী উপসংহারে উপনীত হচ্ছেন এবং উভয়ই স্বীয় দাবীর ওপর অটল থাকছেন, অথচ তাঁদের উপসংহারের এই পারস্পরিক বৈপরীত্যই প্রমাণ করে যে, তাঁদের দু'জনের

মতামতের অন্ততঃ একজনের মতামত অবশ্যই ভ্রান্ত। (অবশ্য কতক ক্ষেত্রে উভয়ের মতামত ভ্রান্ত হওয়াও অসম্ভব নয়।[1])

উপরোক্ত কারণেই দেখা যায় যে, বিচারবুদ্ধি তথা যুক্তির ওপর ভিত্তিশীল অন্যতম প্রধান শাস্ত্র দর্শনের কতক প-িত জীবন ও জগতের অন্তরালে নিহিত মহাসত্য উদ্ঘাটন সংক্রান্ত আলোচনায় ভ্রান্ত যুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে নাস্তিকতার উপসংহারে উপনীত হয়েছেন এবং সঠিকভাবে সমালোচনা ও পর্যালোচনা ব্যতীতই আধুনিক উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে তাঁদের মতামত পড়ানো হচ্ছে। ফলে এ সব নামী-দামী

---

1 বিষয়টি যুক্তিবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে কোন্ ধরনের তার ওপর নির্ভর করে। কারণ, যুক্তিবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে কোনো কিছু প্রমাণের জন্য উপস্থাপিত বক্তব্য > < পাঁচ ধরনের মধ্য থেকে যে কোনো এক ধরনের হতে পারে, তা হচ্ছে ঃ অকাট্য প্রমাণিত বক্তব্য (برهان), বিতর্কে প্রতিষ্ঠিত বা আপাতঃপ্রমাণিত বিষয় (جدال), আবেগময় ভাষণ (خطاب), কবিতা (شعر) ও ভ্রমাত্মক যুক্তি বা অপযুক্তি (مغالطة)। এর মধ্যে প্রথম ধরনের বক্তব্য সুস্থ বিচারবুদ্ধির নিকট অবশ্য গ্রহণযোগ্য। দ্বিতীয় ধরনের বক্তব্যের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই যে, পরস্পরবিরোধী বক্তব্যসমূহের মধ্য থেকে একটিও অকাট্যভাবে প্রমাণিত না হলেও যেটি বাদে বাকীগুলোর ভ্রান্তি অকাট্যভাবে প্রমাণিত হয়ে যায় আপাততঃ সেটিকে গ্রহণ করা ছাড়া গত্যন্তর নেই, যদিও ভবিষ্যতে নতুন কোনো তথ্য হাযির হয়ে সেটিকে বাতিল করে দেয়ার সম্ভাবনা অস্বীকার করা যায় না। বাকী তিন ধরনের বক্তব্য দ্বারা কোনো কিছু প্রমাণিত হয় না। অন্যদিকে বিষয়বস্তুর বিভক্তির ওপরও কোনো বক্তব্যের প্রামাণ্যতা নির্ভর করে। অর্থাৎ কোনো বিষয়কে তৃতীয় ভাগের সম্ভাবনাবিহীনভাবে পরস্পর বিরোধী দুই ভাগে বিভক্ত করা হলে অনিবার্যভাবে সত্য তার একদিকে থাকবে, কিন্তু যেখানে উপস্থাপিত দুই ভাগের বাইরে তৃতীয় ভাগের সম্ভাবনা থাকে সেখানে উপস্থাপিত পরস্পরবিরোধী উভয় দাবীই ভ্রান্ত হতে পারে এবং প্রকৃত অবস্থা অজানা বা অনুপস্থাপিত থেকে যেতে পারে। যেমন ঃ একটি বস্তু রংবিশিষ্ট বা রংহীন-এর মধ্য হতে যে কোনো একটি হতে বাধ্য, কিন্তু তা সাদা বা কালোর মধ্যে যে কোনো একটি হতে বাধ্য নয়, কারণ তা সাদা-কালোর মাঝামাঝি বা তৃতীয় কোনো রংবিশিষ্ট হতে পারে।

দার্শনিকের মতামতকে অন্ধভাবে গ্রহণ করে অনেকে নাস্তিক হয়ে গেছে। আর এরই প্রতিক্রিয়ায় অনেকে ইসলাম বিষয়ক আলোচনায় বিচারবুদ্ধি ও যুক্তিপ্রয়োগকে স্থান দিতে পুরোপুরি অস্বীকৃতি জানিয়েছেন। কারণ, তাঁদের ভয়, বিচারবুদ্ধি বা যুক্তিপ্রয়োগ নাস্তিকতার পথকে উন্মুক্ত করে দেবে এবং দ্বীনে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করবে। এর বিপরীতে আরেক দল বিচারবুদ্ধির ওপর এত বেশী গুরুত্ব আরোপ করেছেন যে, তাঁরা মানুষকে খোদায়ী পথনির্দেশের মুখাপেক্ষিতা থেকে মুক্ত গণ্য করেছেন।

এ সব কারণে বিচারবুদ্ধির বিচরণ ও প্রয়োগক্ষেত্রসমূহ, বিভিন্ন প্রয়োগক্ষেত্রে বিচারবুদ্ধির মর্যাদা ও ভুমিকার তারতম্য এবং বিচারবুদ্ধির অকাট্য রায় ও বিচারবুদ্ধির রায়ের নামে ভ্রমাত্মক যুক্তি (fallacy)র মধ্যকার পার্থক্য সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা থাকা অপরিহার্য।

দ্বীন ও দর্শন হচ্ছে বিচারবুদ্ধির দুই বিচরণক্ষেত্র। তবে দুই বিচরণক্ষেত্রে বিচারবুদ্ধির ভূমিকা ও মর্যাদায় যথেষ্ট পার্থক্য রয়েছে। বস্তুতঃ জীবন ও জগতের মৌলিকতম সত্য উদ্ঘাটন দ্বীন ও দর্শন উভয়েরই লক্ষ্য। আর এ লক্ষ্যে উপনীত হবার সর্বপ্রথম একমাত্র সর্বজনীন মাধ্যম হচ্ছে বিচারবুদ্ধি। কিন্তু পরবর্তী পর্যায়ে দ্বীন ও দর্শনে বিচারবুদ্ধির বিচরণক্ষেত্র ও ভূমিকা পৃথক হয়ে যায়। দর্শন তার খুটিনাটি বিষয়েও বিচারবুদ্ধিকে একমাত্র আবিষ্কর্তা হিসেবে গণ্য করে, কিন্তু দ্বীনের ক্ষেত্রে খুটিনাটি বিষয়ে বিচারবুদ্ধির ভূমিকা হচ্ছে সহায়ক শক্তির ভূমিকা। অন্যদিকে দ্বীনের ক্ষেত্র দর্শনের ক্ষেত্রের তুলনায় অনেক বেশী প্রশস্ত। ফলে আয়তনের দৃষ্টিতে দ্বীনী ক্ষেত্রে বিচারবুদ্ধির ভূমিকা অনেক বেশী, যদিও দর্শনে একমাত্র তথ্যসূত্র ও বিচারকর্তা হবার কারণে বিচারবুদ্ধির ভূমিকা সেখানে অধিকতর অনুভূত হয়ে থাকে।

দর্শন ও দ্বীন উভয়ই জীবন ও জগত সংক্রান্ত যে মৌলিক প্রশ্নগুলোর জবাব বিচারবুদ্ধির সাহায্যে উদ্ঘাটন করে তা হচ্ছে ঃ এ

জীবন ও জগতের অন্তরালে কোনো সৃষ্টিকর্তা আছেন কি? থাকলে এক, নাকি একাধিক? থাকলে সে সৃষ্টিকর্তার গুণবৈশিষ্ট্যসমূহ কী? আমাদের বস্তুদেহের অন্তরালে কোনো অবস্তুগত সত্ত্বা আছে কি? সৃষ্টিকর্তার সাথে আমাদের সম্পর্ক কী? আমরা কি তাঁর নিকট থেকে পথনির্দেশের মুখাপেক্ষী? সে পথনির্দেশ অনুযায়ী আমাদের পার্থিব জীবনের কর্ম ও আচরণের ব্যাপারে কোনোরূপ জবাবদিহিতা (পরকালীন বিচার) কি অপরিহার্য? সৃষ্টিকর্তার পথনির্দেশ কীভাবে ও কা'র মাধ্যমে পাওয়া যেতে পারে? তাঁকে (নবীকে) চেনার উপায় কী? খোদায়ী পথনির্দেশ হিসেবে দাবীদার গ্রন্থাবলীর দাবীর সত্যাসত্য নির্ণয়ের উপায় কী?

বিচারবুদ্ধির সাহায্যে বিস্তারিত আলোচনা-পর্যালোচনার মাধ্যমে এ সব প্রশ্নের জবাব উদ্ঘাটন করা সম্ভব ও অপরিহার্য।

বিচারবুদ্ধি সম্ভাব্য সকল পন্থায় বিচার-বিশ্লেষণের পর যখন সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্ব ও একত্ব (তাওহীদ), পরকালীন জীবনের অস্তিত্বের ও সে জীবনে ইহজীবনের কর্ম ও আচরণের ব্যাপারে জবাবদিহিতার অপরিহার্যতা, প্রত্যাদেশ (ওয়াহী) ও প্রত্যাদেশবাহক (নবী-রাসূল)-এর প্রয়োজনীয়তা, হযরত মুহাম্মাদ (ছ্বাঃ)-এর বিশ্বজনীন ও সর্বশেষ নবী হওয়া এবং কোরআন মজীদের পূর্ণাঙ্গ, অবিকৃত ও সংরক্ষিত সর্বশেষ ঐশী গ্রন্থ হওয়ার সত্যতা উদ্ঘাটন করে, তখন তার সামনে এ সব মৌলিক ধারণার শাখা-প্রশাখা এবং মানুষের দায়িত্ব-কর্তব্য – এই দু'টি বিশাল ক্ষেত্র সমুপস্থিত হয়। এ দু'টি ক্ষেত্র এমন যেখানকার কতক প্রশ্নের জবাব দেয়া বিচারবুদ্ধির পক্ষে সম্ভব হলেও অনেক প্রশ্নের জবাব দেয়াই তার পক্ষে সম্ভব নয়। উদাহরণস্বরূপ, মানব প্রজাতির সূচনার ইতিহাস, ফেরেশতা নামক বিশেষ সৃষ্টির অস্তিত্ব আছে কি নেই, সৃষ্টিকর্তার নিকট আনুষ্ঠানিক প্রার্থনার প্রয়োজন আছে কিনা এবং থাকলে তা কীভাবে করতে হবে – এ সব প্রশ্নের জবাব দেয়া বিচারবুদ্ধির পক্ষে সম্ভব নয়। তাই এ বিশাল ক্ষেত্রের সকল প্রশ্নের মুখ্য জবাবদানকারী হিসাবে কোরআন মজীদের

দ্বারস্থ হতে হবে। যেহেতু বিচারবুদ্ধি রাসূলে আকরাম হযরত মুহাম্মাদ (ছ্বাঃ)-এর নবুওয়াত ও কোরআন মজীদের ঐশিতার ব্যাপারে অকাট্য প্রত্যয়ে উপনীত হয়েছে সেহেতু বিচারবুদ্ধির জন্যে কোরআন মজীদের প্রতিটি তত্ত্ব, তথ্য, পথনির্দেশ ও আদেশ-নিষেধকে বিনা প্রশ্নে গ্রহণ করে নেয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই। কারণ, এর ব্যতিক্রম করা মানে তার (বিচারবুদ্ধির) নিজের প্রত্যয়ের অকাট্যতাকেই প্রশ্নের সম্মুখীন করা।

অবশ্য এর মানে এ নয় যে, কোরআন মজীদের সত্যতার ব্যাপারে অকাট্য প্রত্যয়ে উপনীত হবার পর আর বিচারবুদ্ধির কোন ভূমিকা থাকবে না। বরং পরবর্তী পর্যায়ে বিচারবুদ্ধি সব সময়ই কোরআন মজীদের পার্শ্বচরের ভূমিকা পালন করবে এবং কোরআন থেকে সঠিক তাৎপর্য গ্রহণে কোরআন চর্চাকারীকে সহায়তা করবে। বিচারবুদ্ধি দ্বীনী সূত্র হিসেবে কোরআন মজীদের পরে গোটা মুসলিম উম্মাহ্‌র মধ্যে শুরু থেকে চলে আসা মতৈক্য (ইজমা'এ উম্মাহ্‌) ও প্রতি স্তরে বিপুল সংখ্যক সূত্রে বর্ণিত (মুতাওয়্যাতির) হাদীছকে সত্যায়িত করে এবং এ তিন সূত্রের সহায়তায়, কম সূত্রে বর্ণিত (খাব্‌রে ওয়্যাহেদ) হাদীছের গ্রহণযোগ্যতা বিচার করে। বিচারবুদ্ধি এ সব সূত্রের সহায়তায় দ্বীনী যুগজিজ্ঞাসার জবাব দান করে।

মোটামুটি এই হলো কোরআন মজীদের সত্যায়ন পরবর্তী পর্যায়ে বিচারবুদ্ধির ভূমিকা।

তবে বিচারবুদ্ধির প্রাথমিক পর্যায়ের ভূমিকা সম্পর্কে আরো কয়েকটি কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন। তা হচ্ছে, বিচারবুদ্ধির অবস্থান ইসলাম ও কোরআন মজীদের আগে। অন্য কথায়, বিচারবুদ্ধি হচ্ছে ইসলাম-গৃহে প্রবেশের দরযা।

ইসলাম গ্রহণ করা-নাকরার বিষয়টি যে সম্পূর্ণরূপে বিচারবুদ্ধির ওপর নির্ভরশীল সে ব্যাপারে দ্বিমতের অবকাশ নেই। কারণ, যারা জন্মসূত্রে মুসলমান ইসলাম ও কোরআন কেবল তাদের কাছে আসে নি, বরং সকল মানুষের কাছে এসেছে। প্রশ্ন হচ্ছে, যে

ব্যক্তি এক ও অদ্বিতীয় সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্বে ও পরকালীন জীবনের অস্তিত্বে অকাট্য প্রত্যয় পোষণ করে না অথবা তা করলেও হযরত মুহাম্মাদ (ছ্বাঃ)কে আল্লাহ্‌র রাসূল ও কোরআন মজীদকে আল্লাহ্‌র প্রেরিত গ্রন্থ বলে জানে না, তার নিকট তো আল্লাহ্‌, রাসূল ও কোরআনের দোহাই অর্থহীন; কীভাবে সে ইসলাম গ্রহণ করবে? অবশ্যই তার বিচারবুদ্ধির সামনে আল্লাহ্‌, পরকাল, রাসূল (ছ্বাঃ) ও কোরআন মজীদের সত্যতা তুলে ধরতে হবে। তার বিচারবুদ্ধি যখন এ সবের ব্যাপারে অকাট্য প্রত্যয়ে উপনীত হবে এবং তা গ্রহণ করে নেবে কেবল তার পরেই কোরআন মজীদ তার নিকট প্রশ্নাতীত দলীল (ডকুমেন্ট) রূপে পরিগণিত হবে।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, বিশ্বে প্রচলিত সকল ধর্মীয় মতাদর্শের মধ্যে একমাত্র ইসলামই হচ্ছে মানুষের জন্য আল্লাহ্‌ তা'আলার দেয়া চিরন্তন জীবনব্যবস্থা। প্রচলিত ধারণায় হযরত মুহাম্মাদ (ছ্বাঃ)-এর নবুওয়াত লাভের মাধ্যমে ইসলামের সূচনা বলে মনে করা হলেও প্রকৃত ব্যাপার তা নয়। বরং মানব প্রজাতির আদি পিতা হযরত আদম('আঃ) থেকে এ দ্বীনের যাত্রা শুরু হয়েছিলো – এটাই কোরআন মজীদের দাবী। হযরত ইবরাহীম ('আঃ) সহ অতীতের অনেক নবী-রাসূলের উক্তি কোরআন মজীদে উদ্ধৃত হয়েছে যে সব উক্তিতে তাঁরা নিজেদেরকে 'মুসলিম' বলে উল্লেখ করেছেন এবং বিশেষ করে হযরত ইবরাহীম ('আঃ) তাঁর অনুসারীদেরকে 'মুসলিমুন' (আল্লাহ্‌ তা'আলার নিকট আত্মসমর্পিত জনগোষ্ঠী) নামকরণ করেন।

মূলতঃ অন্যান্য ধর্মীয় মতাদর্শের সৃষ্টি হয়েছে এ চিরন্তন খোদায়ী জীবনব্যবস্থা থেকে পথচ্যুতি, বিকৃতি ও বিভ্রান্তির মাধ্যমে। বিভিন্ন ধর্মের নামকরণ থেকেও ইসলাম ও এ সব ধর্মের মধ্যকার একটি মৌলিক পার্থক্য ধরা পড়ে। অন্যান্য ধর্মের নামকরণ হয়েছে বিভিন্ন ব্যক্তি, গোষ্ঠী বা স্থানের নামে। যেমন ঃ বুদ্ধের নামে বৌদ্ধ ধর্ম, ঈসা ('আঃ)/ ক্রাইস্ট-এর নামে ঈসায়ী বা

খৃীস্টধর্ম, ইয়াহূদা/ যীহূদা-র গোত্রের নামে ইয়াহূদী ধর্ম, হিন্দ্-এর (ভারতের) অধিবাসীদের ধর্ম হিসেবে হিন্দু ধর্ম ইত্যাদি। কিন্তু একমাত্র 'ইসলাম'-এর নামকরণ করা হয়েছে এ ধর্মের বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে; আল্লাহ্ তা'আলার নিকট নিঃশর্ত আত্মসমর্পণই এ ধর্মের মূল কথা বিধায় এ ধর্মের নাম হয়েছে 'ইসলাম' (আত্মসমর্পণ)। আর যেহেতু আল্লাহ্ তা'আলা স্থান-কাল নির্বিশেষে সকল মানুষের স্রষ্টা সেহেতু বংশ-গোত্র, স্থান-কাল নির্বিশেষে সকল মানুষেরই তাঁর নিকট আত্মসমর্পণ অপরিহার্য। অবশ্য অন্যান্য সৃষ্টির ন্যায় তারাও তাঁর প্রাকৃতিক বিধানের নিকট আত্মসমর্পণ করে আছে, তাই বিচারবুদ্ধির দাবী হচ্ছে, স্বাধীন এক্তিয়ারাধীন বিষয়াদিতেও তারা আল্লাহ্ তা'আলার পসন্দ-অপসন্দের নিকট স্বেচ্ছায় আত্মসমর্পণ করবে।

ব্যক্তি, গোষ্ঠী ও স্থানকে কেন্দ্র করে (মূলতঃ ব্যক্তি, গোষ্ঠী ও স্থানের নামকে স্লোগান হিসেবে ব্যবহার করে) আদি ও চিরন্তন সত্য দ্বীন ইসলাম থেকে বিচ্যুত হওয়ার কারণেই অন্য সমস্ত ধর্মই তাদের উপস্থাপিত মৌলিক তাত্ত্বিক দাবীসমূহকে অন্ধ বিশ্বাসের ওপর ভিত্তিশীল করে উপস্থাপন করেছে। তারা তাদের মৌলিক বিশ্বাসসমূহকে 'আক্বল্ বা বিচারবুদ্ধির আদালতে পেশ করতে ও যুক্তির মানদে- পরীক্ষা করতে দিতে রাযী হয় নি। তারা 'ভক্তিতে মুক্তি' এবং 'বিশ্বাসে মিলায় বস্তু, তর্কে বহু দূর' ইত্যাদি আবেগময় বক্তব্যের সাহায্যে মানুষকে অন্ধ বিশ্বাসের ওপর ধরে রাখার চেষ্টা করেছে। আর এর বিপরীতে কোরআন মজীদ মানুষকে অন্ধ বিশ্বাস পরিত্যাগ করে 'আক্বল্ বা বিচারবুদ্ধির ভিত্তিতে জীবন ও জগতের মহাসত্য সংক্রান্ত প্রশ্নসমূহের জবাব সন্ধানের আহ্বান জানিয়েছে এবং তাদেরকে বিচারবুদ্ধি প্রয়োগের জন্য বার বার উৎসাহিত করেছে, আর যারা বিচারবুদ্ধির প্রয়োগ করে না তাদেরকে তিরস্কার করেছে।

বস্তুতঃ দ্বীনের উপস্থাপিত মৌলিকতম দাবীসমূহের ক্ষেত্রে বিচারবুদ্ধির আশ্রয় গ্রহণ করা না হলে ইসলামের প্রচার ও বিস্তার লাভের কোনো পথই থাকে না। কারণ, এ ব্যাপারে অন্ধ বিশ্বাসের নীতি অনুসরণ ও অন্ধ বিশ্বাস গ্রহণের আবেদন জানানোর (যা অনেক মুসলমানই করে থাকেন) অনিবার্য পরিণাম হচ্ছে এই যে, প্রত্যেকেই জন্মসূত্রে প্রাপ্ত নিজ নিজ ধর্মের ওপর স্থির থাকবে, ইসলাম গ্রহণ করবে না। কিন্তু যেহেতু অন্ধ বিশ্বাস হচ্ছে মিথ্যার আশ্রয়স্থল সেহেতু ইসলাম বিচারবুদ্ধির অস্ত্র দ্বারা তাদের বিশ্বাসের দুর্গে আঘাত হেনেছে। তাই অন্ধ বিশ্বাসকে যদি 'ধর্মের' ভিত্তি বলে স্বীকার করা হয়, তাহলে বলতে হবে যে, ইসলাম একটি 'ধর্মবিরোধী' মতাদর্শ বা দর্শন, যা মানুষকে বিশ্বাসের বা ধর্মের অন্ধ গলি থেকে বের করে এনে বিচারবুদ্ধির মহাসড়কে তুলে দেয় এবং দেখেশুনে নিজের জন্য চলার পথ বেছে নিতে বলে। বস্তুতঃ জীবন ও জগতের মহাসত্য প্রশ্নে ইসলাম সকল যুগেই মানুষকে বিশ্বাসের[১] অনুসরণ পরিত্যাগ করে বিচারবুদ্ধির

---

1 এ এক ঐতিহাসিক দুর্ঘটনা যে, উপযুক্ত পরিভাষা খুঁজে না পাওয়ার কারণে বাংলা ভাষায় 'ঈমান' (ايمان)-এর অনুবাদ করা হয়েছে 'বিশ্বাস'। অথচ প্রকৃত ব্যাপার হলো ايمان-এর আভিধানিক অর্থ 'নিরাপদকরণ'। কোরআন মজীদে এরশাদ হয়েছে ঃ و آمنهم من خوف – "আর যিনি তাদেরকে ভীতি থেকে নিরাপদ করেছেন।" (সূরাহ্ কুরাইশ ঃ ৪) শব্দটির পারিভাষিক অর্থ হলো আল্লাহ্, পরকালীন জীবন এবং আল্লাহ্র বাণী ও বাণীবাহক (নবী)কে আশ্রয় করে নিজেকে প্রকৃত ক্ষতি থেকে সুরক্ষিতকরণ। আর 'বিশ্বাস'-এর আরবী প্রতিশব্দ হচ্ছে ظن (বিশ্বাস বা ধারণা)। ظن (বিশ্বাস) ও شک (সন্দেহ) – উভয়ই 'ধারণা' মাত্র; কোনোটিই অকাট্য সত্য হওয়ার নিশ্চয়তার অধিকারী নয়। এ দু'টি পরিভাষার মধ্যে পার্থক্য কেবল এখানে যে, ظن (বিশ্বাস) পোষণকারী ব্যক্তি একটি ধারণাকে সত্য বলে মনে করে এবং شک (সন্দেহ) পোষণকারী ব্যক্তি সংশ্লিষ্ট একটি ধারণাকে অসত্য বলে মনে করে। কিন্তু প্রকৃত সত্য উভয়ের ধারণারই বিপরীত বা তা থেকে ভিন্ন কিছু হতে পারে। যেমন ঃ একটি দরযাবন্ধ ঘরের সামনে এসে কোনো ব্যক্তি মনে করতে পারে যে, ঘরের ভিতরে কোনো মানুষ আছে এবং অপর একজন মনে

ফয়সালা মেনে নেয়ার জন্যে অনুপ্রাণিত করেছে। ইসলাম বলছে ঃ তুমি নিজেই চিন্তা করে দেখো, এটাই সত্য, নাকি ঐগুলো সত্য?

কোরআন মজীদ যে বিচারবুদ্ধির ওপর কতোখানি গুরুত্ব আরোপ করেছে তা অনুধাবনের জন্য ইসলামের মূলনীতি উপস্থাপনে যুক্তির আশ্রয় গ্রহণ সহ কোরআনে ‘বিচারবুদ্ধি’ (عقل – ‘আক্বল্) শব্দটির ব্যবহারের প্রতি দৃষ্টি দেয়াই যথেষ্ট। বিচারবুদ্ধি বা যুক্তির আশ্রয় গ্রহণের পাশাপাশি কোরআন মজীদ মোট ৪৯ বার ‘আক্বল্ শব্দমূল থেকে নিষ্পন্ন শব্দাবলী ব্যবহার করেছে। এর মধ্যে ১৩ বার বলা হয়েছে ঃ افلا تعقلون (অতঃপর তোমরা কি বিচারবুদ্ধি কাজে লাগাবে না?) ৮টি আয়াতে বিভিন্ন বিষয় বর্ণনা করার পর বর্ণনার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বলা হয়েছে ঃ لعلكم تعقلون (যাতে তোমরা বিচারবুদ্ধি প্রয়োগ করো/ বিচারবুদ্ধি দ্বারা অনুধাবন করো)। দু’টি আয়াতে বলা হয়েছে ঃ ان كنتم تعقلون (যদি তোমরা বিচারবুদ্ধি প্রয়োগ করো)।

কোরআন মজীদ স্বয়ং তার দ্বীনের মৌলিকতম বিষয়সমূহ উপস্থানের ক্ষেত্রে বার বার বিচারবুদ্ধি (عقل)-এর আশ্রয় নিয়েছে। যেমন, এরশাদ হয়েছে ঃ

و هو الذى يحي و يميت و له اختلاف الیل و النهار. افلا تعقلون.

“আর তিনিই প্রাণের উদ্ভব ঘটান ও মৃত্যু প্রদান করেন এবং দিন ও রাত্রির পরিবর্তন তাঁরই এক্তিয়ারে; অতঃপর তোমরা কি বিচারবুদ্ধি প্রয়োগ করবে না?” (সূরাহ্ আল-মু’মিনূন্ ঃ ৮০)

করতে পারে যে, ঘরের মধ্যে কেউ নেই। অতঃপর উভয়ে ঘরটিতে প্রবেশ করার সাথে সাথে তাদের ওপর একটি বাঘ ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে। আল্লাহ্ তা‘আলা এরশাদ করেন ঃ ان الظن لا يغنى من الحق شيئاً – “নিঃসন্দেহে বিশ্বাস (বা ধারণা) সত্য থেকে মোটেই বেনিয়ায করে না।” (সূরাহ্ ইউনুস ঃ ৩৪)

সমগ্র সৃষ্টিজগতের পরতে পরতে একজন মহাজ্ঞানী স্রষ্টার নিদর্শন বিদ্যমান – এদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে কোরআন মজীদের বিভিন্ন আয়াতে বিচারবুদ্ধির ভিত্তিতে সৃষ্টিকর্তা সংক্রান্ত বিতর্কের সমাধানের জন্য আহ্বান জানানো হয়েছে। এ ক্ষেত্রে অনেক আয়াতে সরাসরি 'বিচারবুদ্ধি' ('আক্বল্) শব্দমূল থেকে নিষ্পন্ন শব্দাবলী ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন, এরশাদ হয়েছে ঃ

و سخر لكم الیل و النهار و الشمس و القمر. و النجومُ مسخرات بامره. ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون.

"আর তিনিই তোমাদের জন্য রাত্রি ও দিনকে এবং সূর্য ও চন্দ্রকে নিয়ন্ত্রিত করেছেন। নক্ষত্রম-লী তাঁরই আদেশে নিয়ন্ত্রিত। নিঃসন্দেহে এতে সেই লোকদের জন্য নিদর্শন রয়েছে যারা বিচারবুদ্ধি প্রয়োগ করে।" (সূরাহ্ আন্-নাহ্ল্ ঃ ১২)

অনুরূপভাবে এরশাদ হয়েছে ঃ

وَإِنَّ لَكُمْ فِي الأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ. وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ.

"আর অবশ্যই তোমাদের জন্যে চতুষ্পদ জন্তুদের মধ্যে চিন্তার খোরাক রয়েছে। আমি তোমাদেরকে তার উদরস্থিত বস্তু থেকে – গোবর ও রক্ত থেকে – নিঃসৃত খাঁটি দুগ্ধ পান করাই যা পানকারীদের জন্য সুপেয়। আর (খাওয়াই) খেজুর গাছের ফল ও আঙ্গুর; তোমরা তা থেকে নেশাকর দ্রব্য ও উত্তম খাদ্য তৈরী করছো। নিঃসন্দেহে এতে সেই লোকদের জন্য নিদর্শন রয়েছে যারা বিচারবুদ্ধি প্রয়োগ করে।" (সূরাহ্ ১৬ – আন্-নাহ্ল্ ঃ ৬৬-৬৭)

আরেক আয়াতে এরশাদ হয়েছে ঃ

ان فى خلق السماوات و الارض و اختلاف الليل والنهار و الفلک التى تجرى فى البحر بما ينفع الناسَ و ما انزل الله من السماء من ماء فاحيا به الارضَ بعد موتها و بث فيها من کل دابة و تصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء و الارض لآيات لقوم يعقلون.

"নিঃসন্দেহে আসমানসমূহ ও পৃথিবীর সৃষ্টিতে, রাত্রি ও দিনের বিবর্তনে, সমুদ্রে চলাচলরত জাহাযসমূহে – যা মানুষকে উপকৃত করে, আল্লাহ্ আসমান থেকে যে পানি বর্ষণ করেন – অতঃপর যা দ্বারা মৃত যমীনকে সঞ্জীবিত করে তোলেন ও তাতে সব ধরনের জীবজন্তু ছড়িয়ে দেন – তাতে এবং বায়ুর আবর্তনে ও আসমান-যমীনের মাঝে ভেসেচলা মেঘমালার মধ্যে সেই লোকদের জন্য নিদর্শন রয়েছে যারা বিচারবুদ্ধি প্রয়োগ করে।" (সূরাহ্ আল্-বাক্বারাহ্ ঃ ১৬৪)

আবার কোনো কোনো আয়াতে একই অর্থে 'চিন্তা করা'র কথা বলা হয়েছে। যেমন, এরশাদ হয়েছে ঃ

و اوحى ربک الى النحل ان اتخذي من الجبال بيوتاً و من الشجر و مما يعرشون. ثم کلى من کل الثمرات فاسلُکى سبل ربکِ ذُلُلاً. يَخرج من بطونها شرابٌ مختلف الوانه فيه شفاءٌ للناس. ان فى ذلک لآياتٌ لقوم يتفکرون.

"আর (হে রাসূল!) আপনার রব মৌমাছিকে এ মর্মে অনুপ্রাণিত করলেন যে, পাহাড়ে, বৃক্ষে ও যা কিছু উঁচু তাতে বাসা বাঁধো, এরপর ফলসমূহ থেকে ভক্ষণ করো, অতঃপর বিনীতভাবে স্বীয় রবের উন্মুক্ত পথসমূহে চলাচল করো। তার উদর থেকে বিভিন্ন রঙের পানীয় বহির্গত হয় যাতে মানুষের জন্য নিরাময় রয়েছে। অবশ্যই এতে সেই লোকদের জন্য নিদর্শনাবলী রয়েছে যারা চিন্তা করে।" (সূরাহ্ ১৬ – আন্-নাহ্ল্ ঃ ৬৮-৬৯)

এভাবে আল্লাহ্ তা‘আলা চান যে, মানুষ চিন্তা-চেতনার অন্ধত্ব থেকে বিচারবুদ্ধির দিকে প্রত্যাবর্তন করুক এবং বিচারবুদ্ধির ফয়সালার ভিত্তিতে আল্লাহ্ তা‘আলার অস্তিত্ব ও একত্বকে গ্রহণ করুক।

মুশরিকদেরকে তাওহীদের দিকে আহ্বান জানাতে গিয়ে হযরত ইবরাহীম (‘আঃ)-এর উক্তি সম্পর্কে কোরআন মজীদে এরশাদ হয়েছে ঃ

قال افتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئاً و لا يضركم. اف لكم و لما تعبدون من دون الله افلا تعقلون.

“(ইবরাহীম) বললো ঃ অতঃপরও কি তোমরা আল্লাহ্কে ব্যতীত এমন কিছুর উপাসনা করবে যা না তোমাদের কোনো কল্যাণ সাধন করতে পারে, আর না কোনো ক্ষতি সাধন করতে পারে? ধিক্কার তোমাদের প্রতি ও তার প্রতি তোমরা আল্লাহ্ ব্যতীত যার উপাসনা করছো; অতঃপর তোমরা কি বিচারবুদ্ধি প্রয়োগ করবে না?” (সূরাহ্ আল-আম্বিয়া’ ঃ ৬৬-৬৭)

এখানে সুস্পষ্টতঃই যুক্তির সাহায্যে অংশীবাদকে খ-ন করা হয়েছে। এছাড়া অনেক আয়াতে ‘অক্বল্ শব্দমূল থেকে নিষ্পন্ন শব্দাবলী ব্যবহার ব্যতীতই কেবল যুক্তিপ্রয়োগের মাধ্যমে নাস্তিক্যবাদ ও অংশীবাদকে খ-ন করা হয়েছে। যেমন, এরশাদ হয়েছে ঃ

ام خلقوا من غير شىء ام هم الخالقون.

“তারা কি কোনোকিছু (কোনো সৃষ্টি-উৎস/ সৃষ্টিকর্তা) ছাড়াই (নিজে নিজেই/ শূন্য থেকেই) সৃষ্ট হয়েছে, নাকি তারা (নিজেরাই নিজেদের) সৃষ্টিকর্তা?” (সূরাহ্ আত্-তূর্ ঃ ৩৫)

لو كان فيهما آلهةٌ الا اللهُ لفسدتا. فسبحان اللهِ ربِ العرش عما يصفون.

“এতদুভয়ে (আসমান ও যমীনে) যদি আল্লাহ্ ছাড়া অন্য উপাস্যম-লী থাকতো তাহলে এতদুভয়ই ধ্বংস হয়ে যেতো।

অতএব, আরশের মালিক আল্লাহ্ তা থেকে পরম প্রমুক্ত যা তারা তাঁর প্রতি আরোপ করছে ।” (সূরাহ্ আল-আম্বিয়া’ ঃ ২২)

অনুরূপভাবে পরকালীন জীবনের সত্যতা সম্বন্ধেও বিচারবুদ্ধির দলীল (যুক্তি) উপস্থাপন করা হয়েছে ঃ

قال من يحي العظام و هى رميم. قل يحييها الذى انشأ اول مرة و هو بكل شىء عليم.

“সে (পরকাল অস্বীকারকারী ব্যক্তি) বলে ঃ ‘পচে-গলে যাওয়া অস্থিগুলোকে কে জীবিত করবে?’ (হে রাসূল!) বলুন, তিনিই তাকে (পচে-গলে যাওয়া অস্থিগুলোকে) জীবিত করবেন যিনি প্রথম বার সৃষ্টি করেছেন; আর তিনি প্রতিটি বিষয় সম্পর্কে চিরজ্ঞানী ।” (সূরাহ্ ইয়া-সীন্ ঃ ৭৮-৭৯)

فسيقولون من يُعيدنا قل الذي فطركم اول مرة.

“অতঃপর অচিরেই তারা বলবে ঃ ‘কে আমাদেরকে (মৃত্যুর পরে) প্রত্যাবর্তিত করাবে?’ (হে রাসূল!) বলুন, তিনিই যিনি প্রথম বারের মতো তোমাদের সৃষ্টির সূচনা করেন ।” (সূরাহ্ আল্-ইস্রাা’/ বানী ইসরাঈল ঃ ৫১)

তেমনি রাসূলে আকরাম হযরত মুহাম্মাদ (ছ্বাঃ)-এর নবুওয়াত সম্বন্ধেও বিচারবুদ্ধির নিকট আবেদন জানানো হয়েছে। হযরত নবী করীম (ছ্বাঃ) নবুওয়াত-প্রাপ্তির পূর্বে দীর্ঘ ৪০ বছর মক্কাহ্ নগরীতে বসবাস করেন। এ সময় তিনি নিষ্কলুষ চরিত্রের লোক হিসেবে সকলের নিকট পরিচিত ছিলেন, তবে লেখাপড়া জানতেন না এবং কারো কাছ থেকে মৌখিকভাবেও জ্ঞান আহরণ করেন নি। মোটের ওপর তিনি জ্ঞানী বা প্রতিভাধর ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত ছিলেন না। এমতাবস্থায় আল্লাহ্ তা‘আলার পক্ষ থেকে নাযিল হওয়া ব্যতীত কোরআন মজীদের ন্যায় উন্নততম সাহিত্যগুণসমৃদ্ধ সীমাহীন জ্ঞানে পরিপূর্ণ মহাগ্রন্থ নিজে রচনা করে উপস্থাপন করা তাঁর পক্ষে কিছুতেই সম্ভব নয়। এদিকে ইঙ্গিত করে এরশাদ হয়েছে ঃ

قل لو شاء الله ما تلوته عليكم و لا ادراكم به فقد لبثت فيكم عُمُراً من قبله. افلا تعقلون.

"(হে রাসূল! তাদেরকে) বলে দিন ঃ আল্লাহ্ যদি চাইতেন (যে, আমাকে নবুওয়াতের দায়িত্ব দেবেন না) তাহলে আমি তোমাদের নিকট তা (কোরআন) পাঠ করতাম না এবং তিনি তোমাদেরকে (এ বিষয়ে) অবহিত করতেন না; এর আগে থেকেই তো আমি আমার জীবন তোমাদের মধ্যেই কাটিয়েছি; অতঃপর তোমরা কি বিচারবুদ্ধি কাজে লাগাবে না?" (সূরাহ্ ইউনুস ঃ ১৬)

কোরআন মজীদ আল্লাহ্‌র কিতাব কিনা তা-ও বিচারবুদ্ধির সাহায্যে পরীক্ষা করে দেখার জন্যে আহ্বান জানানো হয়েছে।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, বিশ্বের সকল ভাষার মধ্যে আরবী ভাষা হচ্ছে ব্যাপকতম ও সূক্ষ্মতম ভাব প্রকাশের সম্ভাবনার অধিকারী একমাত্র ভাষা, আর হযরত রাসূলে আকরাম (ছ্বাঃ)-এর ওপর কোরআন নাযিলের যুগে আরবী ভাষার চর্চা (কবিতা ও ভাষণ উভয় ক্ষেত্রে) উন্নতির চরমতম শিখরে উপনীত হয়েছিলো। অন্য যে কোনো ভাষার ও আরবী ভাষার প্রকাশক্ষমতার মধ্যে পার্থক্য এতোই বেশী যে, আরবরা এ পার্থক্য লক্ষ্য করে অনারবদেরকে "আ'জামী" (বোবা) বলে অভিহিত করতো। বস্তুতঃ আরবী ভাষার নামটিও এর বৈশিষ্ট্যপ্রকাশক; عربى ('আরাবী) মানে 'প্রাঞ্জলভাষী' এবং لسان عربى (লিসানে 'আরাবী) মানে 'প্রাঞ্জল ভাষা'। আল্লাহ্ তা'আলা উন্নততম প্রকাশক্ষমতাসম্পন্ন ভাষায় কোরআন নাযিল করেছেন এবং এ গ্রন্থের সাহিত্যিক মান ও প্রকাশক্ষমতা এমন চূড়ান্ত পর্যায়ের যে, আরবীভাষী শ্রেষ্ঠতম কবি ও বাগ্মীগণ এর মোকাবিলায় চরমভাবে নিস্প্রভ হয়ে পড়ায় অকাট্যভাবে প্রমাণিত হয় যে, এ গ্রন্থ কোনো মানুষের পক্ষে রচনা করা সম্ভব নয়। এদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে আল্লাহ্ তা'আলা এরশাদ করেন ঃ

ان انزلناه قرآناً عربياً لعلكم تعقلون.

“অবশ্যই আমি একে (এ গ্রন্থকে) প্রাঞ্জলতম (আরবী) পঠনীয় (কোরআন) রূপে অবতীর্ণ করেছি যাতে তোমরা বিচারবুদ্ধি প্রয়োগ করো (এবং এটি যে আল্লাহ্ কর্তৃক প্রেরিত গ্রন্থ তা বুঝতে পারো)।” (সূরাহ্ ইউসুফ ঃ ২; সূরাহ্ আয্-যুখরূফ ঃ ৩)

আল্লাহ্ তা‘আলা কাফেরদেরকে কোরআনের সমতুল্য বক্তব্য রচনা করার জন্য চ্যালেঞ্জ প্রদান করে বলেন ঃ

ام يقولون تقَوّله. بل لا يؤمنون. فليأتوا بحديث مثله ان كانوا صادقين.

“তারা কি বলে যে, তিনি [মুহাম্মাদ (ছ্বাঃ) নিজেই] এটি (কোরআন) বলেছেন (রচনা করেছেন)? বরং তারা তো (নিজেরাই তাদের এ কথায়) আস্থা পোষণ করে না। তারা যদি (তাদের দাবীর প্রশ্নে) সত্যবাদী হয়ে থাকে (তারা মুখে যা বলছে এটাই যদি তাদের অন্তরের প্রত্যয় হয়ে থাকে) তাহলে তারা এর (কোরআনের) অনুরূপ (মানসম্পন্ন) বক্তব্য নিয়ে আসুক (রচনা করুক)।” (সূরাহ্ আত্-তূর্ ঃ ৩৩-৩৪)

বস্তুতঃ সমগ্র সৃষ্টিলোকে আল্লাহ্ তা‘আলার অস্তিত্বের অসংখ্য নিদর্শন বিদ্যমান যা থেকে বিচারবুদ্ধি প্রয়োগকারী লোকেরা খুব সহজেই মহাসত্যে উপনীত হতে সক্ষম। কোরআন মজীদের বিভিন্ন আয়াতে এ বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে। শুধু তা-ই নয়, আল্লাহ্ তা‘আলা কোরআন মজীদে তাঁর নিদর্শনাবলীর যে বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন তার মুখ্য লক্ষ্যই হচ্ছে বিচারবুদ্ধি প্রয়োগকারী লোকেরা। তাই এক আয়াতের শেষাংশে এরশাদ হয়েছে ঃ

كذلک نفصِّل الآيات لقومٍ يعقلون.

“আমি এভাবেই সেই লোকদের জন্য বিস্তারিতভাবে নিদর্শনাবলী বর্ণনা করি যারা বিচারবুদ্ধি প্রয়োগ করে।” (সূরাহ্ আর্-রূম্ ঃ ২৮)

যারা পূর্ববর্তীদের অন্ধ অনুসরণকে বিচারবুদ্ধির ওপর অগ্রাধিকার প্রদান করে কোরআন মজীদ তাদের কঠোর সমালোচনা

ও নিন্দা করেছে এবং তাদের এ কর্মনীতিকে তাদের হেদায়াত (সঠিক পথের সন্ধান) না পাওয়ার কারণ স্বরূপ গণ্য করেছে। শুধু তা-ই নয়, আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে চতুষ্পদ জন্তুর সাথে তুলনা করেছেন এবং (অন্তরের দিক থেকে) অন্ধ, বধির ও বোবা বলে তিরস্কার করেছেন। এরশাদ হয়েছে ঃ

و اذا قيل لهم اتّبعوا ما انزل الله قالوا بل نتبع ما الفينا عليه آباءَنا. اوَ لو كان آباؤُهم لا يعقلون شيئاً و لا يهتدون. و مثل الذين كفروا كمثل الذى ينعق بما لا يسمع الاّ دعاءً و نداءً. صُم بكم عمىٌّ فهم لا يعقلون.

"আর যখন তাদেরকে বলা হয়, 'আল্লাহ্ যা নাযিল করেছেন তার অনুসরণ করো', তখন তারা বলে, 'বরং আমরা তারই অনুসরণ করবো যার ওপর আমাদের পিতৃপুরুষদের পেয়েছি।' তাদের পিতৃপুরুষরা যদি মোটেই বিচারবুদ্ধি প্রয়োগ না করে থাকে এবং সঠিক পথ (হেদায়াত) প্রাপ্ত না হয়ে থাকে (তবুও কি তারা তাদের অনুসরণ করবে)? আর যারা কাফের হয়েছে (সত্য দ্বীনকে প্রত্যাখ্যান করেছে) তাদের উপমা হচ্ছে তার ন্যায় যাকে ডাকা হলে সে হাকডাক ছাড়া আর কিছুই শুনতে পায় না (অর্থ বুঝতে পারে না); তারা বধির, বোবা ও অন্ধ, সুতরাং তারা বিচারবুদ্ধি প্রয়োগ করবে না।" (সূরাহ্ আল-বাক্বারাহ্ ঃ ১৭০-১৭১)

অন্যত্র এরশাদ হয়েছে ঃ

و اذا قيل لهم تعالوا الى ما انزل الله و الى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا. و لو كان آباءهم لا يعلمون شيئاً و لا يهتدون.

"তাদেরকে যখন বলা হয়, 'আল্লাহ্ যা নাযিল করেছেন তার দিকে ও রাসূলের দিকে এসো,' তখন তারা বলে, 'আমরা আমাদের পিতৃপুরুষদেরকে যার ওপর পেয়েছি তা-ই আমাদের জন্য যথেষ্ট'। তাদের পিতৃপুরুষরা যদি মোটেই জ্ঞানের অধিকারী না থেকে থাকে

এবং সঠিক পথ না পেয়ে থাকে (তবুও কি তারা তাদের অনুসরণ করবে)?" (সূরাহ্ আল্-মাাএদাহ্ ঃ ১০৪)

যুগে যুগে যারা নবী-রাসূলগণের দাও'আত প্রত্যাখ্যান করেছে তাদের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিলো এই যে, তারা তাদের পিতৃপুরুষদের অনুসৃত নীতি-আদর্শ অনুসরণের যুক্তিতে তা প্রত্যাখ্যান করে। এরশাদ হয়েছে ঃ

بل قالوا انّا وجدنا آباءنا على امة و انّا على آثارهم مهتدون. و كذلک ما ارسلنا من قبلک فى قرية من نذير الا قال مترفوها انّا وجدنا آباءنا على امة و انّا على آثارهم مقتدون.

"বরং তারা বলে, 'অবশ্যই আমরা আমাদের পিতৃপুরুষদেরকে একটি আদর্শের ওপর পেয়েছি এবং অবশ্যই আমরা তাঁদের কর্মের ভিত্তিতে সঠিক পথপ্রাপ্ত আছি।' আর এভাবেই, আপনার আগেও কোনো জনপদে এমন কোনো সতর্ককারী পাঠাই নি যাকে সেখানকার প্রভাবশালী ব্যক্তিরা বলে নি, 'অবশ্যই আমরা আমাদের পিতৃ পুরুষদেরকে একটি আদর্শের ওপর পেয়েছি এবং অবশ্যই আমরা তাঁদের কর্মের অনুসরণকারী'।" (সূরাহ্ আয্-যুখরূফ্ ঃ ২২-২৩)

অনুরূপভাবে সূরাহ্ আল্-আ'রাফ-এর ২৮ ও ৯৫, সূরাহ্ ইউনুস-এর ৭৮, সূরাহ্ আল্-আম্বিয়াা'-এর ৫৩ ও ৫৪, সূরাহ্ আশ্-শূ'আরা-এর ৭৪ এবং সূরাহ্ লোকমান-এর ২১ নং আয়াতে কাফের-মুশরিকদের পক্ষ থেকে পূর্বপুরুষদের অনুসরণের যুক্তি পেশ করার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। বলা বাহুল্য যে, বিচারবুদ্ধি ও আল্লাহ্র কালামের বিপরীতে পূর্ববর্তীদের (পিতৃপুরুষ, মুরুব্বী, ধর্মীয় প-িত ও ধর্মনেতা নির্বিশেষে) অনুসরণের যুক্তি উপস্থাপন কোরআন মজীদের দৃষ্টিতে নিন্দনীয় ও বাতিল কর্মনীতি এবং তা কেবল কাফের-মুশরিকদের বেলায়ই প্রযোজ্য নয়, বরং সর্বজনীনভাবে প্রযোজ্য। তাই 'অতীতের মনীষীগণ কি ইসলামকে কম

বুঝেছিলেন?' এরূপ যুক্তিতে বিচারবুদ্ধির যুক্তি ও কোরআন মজীদ কী বলেছে তা শুনতে না চাওয়া যে গোমরাহীর কারণ তাতে সন্দেহ নেই। বস্তুতঃ বিচারবুদ্ধির অকাট্য রায়, আল্লাহ্‌র কালাম এবং রাসূলে আকরাম হযরত মুহাম্মাদ (ছ্বাঃ)-এর মত, আচরণ ও তাঁর অনুমোদিত আচরণ হিসেবে অকাট্য ও সর্বসম্মতভাবে প্রমাণিত বক্তব্য (মুতাওয়াাতির হাদীছ ও ইজামা'এ উম্মাহ্) ছাড়া কারো কোনো কথাই ভুলের উর্ধে বলে গণ্য করে অন্ধভাবে অনুসরণ পুরোপুরিভাবে ইসলাম কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত কর্মনীতি।

মুসলমানের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে কোনো মতের পক্ষে-বিপক্ষে উপস্থাপিত বক্তব্য শোনা এবং এরপর তার মধ্য থেকে সঠিক বা উত্তমটিকে গ্রহণ করা। শুনলে পূর্বেকার ধারণা পাল্টে যেতে পারে বা যা বলা হবে তা শ্রোতার অনুসৃত বা শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তির মতের সাথে সাংঘর্ষিক হবার সম্ভাবনা আছে, এ কারণে কারো তত্ত্ব বা তথ্যপূর্ণ কথা শুনতে অস্বীকার করা মুসলমানের বৈশিষ্ট্য নয়। আল্লাহ্ তা'আলা এরশাদ করেন ঃ

فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون ما احسنه. اولئک الذين هداهم الله و اولئک هم اولوا الالباب.

"অতএব, (হে রাসূল!) সেই বান্দাহ্‌দেরকে সুসংবাদ দিন যারা বক্তব্য শোনে, অতঃপর তার মধ্য থেকে যা সর্বোত্তম তার অনুসরণ করে। এরাই হচ্ছে তারা যাদেরকে আল্লাহ্ সঠিক পথ দেখিয়েছেন এবং এরাই হচ্ছে প্রকৃত জ্ঞানবান।" (সূরাহ্ আয্-যুমার ঃ ১৭-১৮)

অন্যত্র ঈমানদারদেরকে সতর্ক করে দিয়ে এরশাদ হয়েছে ঃ

و لا تكونوا كالذين قالوا سمعنا و هم لا يسمعون. ان شر الدوابّ عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون.

“আর তোমরা তাদের ন্যায় হয়ো না যারা বলে, ‘আমরা শুনেছি,’ অথচ তারা (ঠিক যেরূপ মনোযোগ দিয়ে শোনা উচিত ছিল সেভাবে) শোনে নি। নিঃসন্দেহে আল্লাহ্‌র নিকট নিকৃষ্টতম জন্তু হচ্ছে সেই বধির-বোবার দল যারা বিচারবুদ্ধি প্রয়োগ করে না।” (সূরাহ্‌ আল-আন্‌ফাল্‌ ঃ ২১-২২)

যারা বিচারবুদ্ধি প্রয়োগ করে না তাদেরকে আরো কয়েকটি আয়াতে তিরস্কার করা হয়েছে। শুধু তা-ই নয়, যারা বিচারবুদ্ধি কাজে লাগায় না আল্লাহ্‌ তা‘আলা তাদেরকে ঈমানের নে‘আমত প্রদান করেন না। এরশাদ হয়েছে ঃ

و ما كان لنفس ان تؤمنَ الاّ باذن الله. و يجعل الرجس على الذين لا يعقلون.

“আল্লাহ্‌র অনুমতি ব্যতীত কেউ ঈমান (পরকালীন জীবনে সুরক্ষা) অর্জন করতে পারে না। আর যারা বিচারবুদ্ধি প্রয়োগ করে না তিনি (আল্লাহ্‌) তাদেরকে কলুষলিপ্ত করে রাখেন (ফলে তারা ঈমানের সুযোগ পায় না)।” (সূরাহ্‌ ইউনুস ঃ ১০০)

এ আয়াতে বিশেষভাবে লক্ষ্য করার বিষয় এই যে, কাউকে বিচারবুদ্ধি না থাকার কারণে নিন্দা ও সমালোচনা করা হয় নি, বরং বিচারবুদ্ধি থাকা সত্ত্বেও তা কাজে না লাগানোর কারণে নিন্দা ও সমালোচনা করা হয়েছে। কোরআন মজীদ এ ক্ষেত্রে ক্রিয়াপদ ব্যবহার করেছে যা প্রমাণ করে যে, এরা বিচারবুদ্ধিবঞ্চিত মানসিক প্রতিবন্ধী নয়, বরং বিচারবুদ্ধির অধিকারী হয়েও তা কাজে লাগানো থেকে বিরত রয়েছে এবং এভাবে নিজেদেরকে বিচারবুদ্ধিবঞ্চিত পশুর পর্যায়ে নামিয়ে এনেছে।

মোদ্দা কথা, কোরআন মজীদ বিচারবুদ্ধির নিকট ইসলামের দাও‘আত পেশ করেছে। কারণ, কোনো মানুষ যতোক্ষণ না অন্ধ বিশ্বাসের খোলস ভেঙ্গে বেরিয়ে এসে বিচারবুদ্ধির আশ্রয় গ্রহণ করে ততোক্ষণ তার পক্ষে সঠিক অর্থে ইসলাম গ্রহণ করা সম্ভব নয়।

ইসলাম গ্রহণের পরে দ্বীনের বিস্তারিত বিষয়াদির ক্ষেত্রে ('আক্বাএদের শাখা-প্রশাখা এবং ফরয ও হারাম সম্পর্কে) অবশ্যই তাকে বিচারবুদ্ধির দ্বারা আল্লাহ্‌র কিতাব হিসেবে চিহ্নিত কোরআন মজীদ থেকে পথনির্দেশ গ্রহণ করতে হবে। তবে কোরআন মজীদের তাৎপর্য গ্রহণের ক্ষেত্রে তাকে বিচারবুদ্ধির আলোকে সতর্কতার সাথে অগ্রসর হতে হবে অর্থাৎ বিচারবুদ্ধির যে সব দলীলের ভিত্তিতে সে তাওহীদ ও আখেরাতের সত্যতা, নবুওয়াত্-এর প্রয়োজনীয়তা ও নবুওয়াতে মুহাম্মাদী (ছ্বাঃ)-এর সত্যতার ফয়সালায় উপনীত হয়েছে সে সবের সাথে সাংঘর্ষিক কোনো তাৎপর্য গ্রহণ করবে না এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে বিভিন্ন তাৎপর্যের সম্ভাবনা থাকলে কেবল বিচারবুদ্ধির সাথে গ্রহণযোগ্য তাৎপর্যটিই গ্রহণ করবে।

এছাড়াও যেহেতু বিচারবুদ্ধি মুতাওয়াাতির তথা প্রতিটি স্তরে বিরাট সংখ্যক সূত্রে বর্ণিত (যতো লোকের পক্ষে মিথ্যা রচনার জন্য মতৈক্যে পৌঁছা বিচারবুদ্ধির দৃষ্টিতে অসম্ভব এতো বেশী লোক কর্তৃক বর্ণিত) হাদীছ এবং ইসলামের প্রথম যুগ থেকে প্রচলিত সর্বসম্মত আমল ও মত (ইজ্‌মা'এ উম্মাহ্) গ্রহণ করে সে সেগুলোকেও গ্রহণ করবে। অতঃপর 'আক্বাএদ্ ও গুরুত্বপূর্ণ আমল (ফরয ও হারাম)-এর আর কোনো বিষয় অবশিষ্ট থাকবে না। অতঃপর গৌণ (মুস্তাহাব্ ও মাকরূহ্) বিষয়াদিতে উক্ত চার দলীলের সাথে সাংঘর্ষিক না হওয়া সাপেক্ষে কম সূত্রে বর্ণিত (খবরে ওয়াাহেদ্) হাদীছ ও মনীষীদের মতামত থেকে সহায়তা নেয়া যাবে এবং নিজের পক্ষে তা সম্ভব না হলে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিশেষজ্ঞ কোনো ব্যক্তির অনুসরণ করতে হবে।

কিন্তু কেউ যদি কোরআন, মুতাওয়াাতির হাদীছ ও ইজ্‌মাা'এ উম্মাহ্ থেকে পথনির্দেশ গ্রহণ না করে শুধু বিচারবুদ্ধির সাহায্যে স্বীয় করণীয় নির্ধারণ করতে চায় অথবা কেউ যদি 'আক্বল্, কোরআন, মুতাওয়াাতির্ হাদীছ্ ও ইজ্‌মাা'এ উম্মাহ্ থেকে হেদায়াত না নিয়ে কেবল অন্যদের ও/বা খবরে ওয়াাহেদ্ হাদীছের অন্ধ অনুসরণ করে

তাহলে তা গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ, বিচারবুদ্ধি যেমন একে সঠিক প্রক্রিয়া বলে রায় দেয় না তেমনি কোরআন মজীদও এ ধরনের অন্ধ অনুসরণের নিন্দা করেছে।

মোদ্দা কথা, বিচারবুদ্ধিকে পুরোপুরি বর্জন করা অথবা শুধু বিচারবুদ্ধির ওপর নির্ভর করা উভয়ই ভুল কর্মপন্থা। বরং বিচারবুদ্ধিকে যথাযথ ক্ষেত্রে ব্যবহার করতে হবে – এটাই 'আক্বল্ বা বিচারবুদ্ধির দাবী; ইসলামের আবেদনও এটাই। বিচারবুদ্ধি হচ্ছে ইসলাম গৃহের দরযা; এ পথেই ইসলামে প্রবেশ করতে হবে এবং এরপর ইসলামকে সঠিকভাবে জানা-বুঝা ও অনুসরণের ক্ষেত্রে বিচারবুদ্ধির ভূমিকা হচ্ছে সহায়ক বা হাতিয়ারের ভূমিকা।

ইসলামী জ্ঞানচর্চায় বিচারবুদ্ধির প্রয়োগক্ষেত্র

ইসলামের মৌলিক ভিত্তি হচ্ছে তাওহীদ, আখেরাত ও নবুওয়াত। (খাত্‌মে নবুওয়াত্‌ ও কোরআন মজীদের মু'জিযাহ্‌ 'নবুওয়াত' প্রসঙ্গেরই দু'টি গুরুত্বপূর্ণ দিক।) ইতিপূর্বে যেমন উল্লেখ করা হয়েছে, স্বয়ং কোরআন মজীদ এ সব বিষয়কে বিচারবুদ্ধির

নিকট পেশ করেছে; এগুলো অন্ধভাবে গ্রহণ করার জন্য আবেদন করে নি।

কোরআন মজীদকে কেবল এ কারণেই নির্ভুল জ্ঞানসূত্র হিসেবে গ্রহণ করতে হবে যে, বিচারবুদ্ধির বিশ্লেষণে এ গ্রন্থটি আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে অবতীর্ণ ও সংরক্ষিত বলে অকাট্যভাবে প্রমাণিত হয়। অন্যান্য জ্ঞানসূত্রের কোনোটি সম্পর্কেই বিচারবুদ্ধি এভাবে "শতকরা একশ' ভাগ নির্ভুল" বলে রায় দেয় না। তবে সর্বজনীন বিচারবুদ্ধি মুতাওয়াাতির্ বর্ণনাকে সত্য বলে গ্রহণ করে। সুতরাং হযরত রাসূলে আকরাম (ছ্বাঃ)-এর উক্তি হিসেবে যা কিছু মুতাওয়াাতির্ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে সে সব যে তাঁরই উক্তি তাতে সন্দেহ নেই এবং কোরআন মজীদের দলীল অনুযায়ীই রাসূলুল্লাহ্ (ছ্বাঃ)-এর যে কোনো বক্তব্য অবশ্যগ্রহণীয় (যদি তা সত্যিই তাঁর বক্তব্য হিসেবে প্রমাণিত হয়; কেবল তাঁর বক্তব্য হিসেবে দাবীকৃত নয়)। অনুরূপভাবে মুতাওয়াাদির সূত্রে বর্ণিত হিসেবে প্রামাণ্য দলীল থাকুক বা না-ই থাকুক, ইসলামের প্রথম যুগসমূহে মুসলমানরা সর্বসম্মতভাবে যে সব আমল করতেন ও যে সব মত পোষণ করতেন (ইজ্‌মাা'এ উম্মাহ্) তা-ও যে, রাসূলুল্লাহ্ (ছ্বাঃ) কর্তৃক আচরিত, নির্দেশিত বা অনুমোদিত বিচারবুদ্ধি তাতেও সন্দেহ পোষণ করে না। অতএব, কেবল গৌণ ও প্রায়োগিক বিষয়াদিতে অন্যান্য জ্ঞানসূত্র (হাদীছ, মনীষীদের ব্যাখ্যা ইত্যাদি) থেকে প্রাপ্ত যে কোনো তথ্য বা মতকেই কেবল এ চার অকাট্য জ্ঞানসূত্র ও মানদ- অর্থাৎ 'আক্বল্, কোরআন, মুতাওয়াাতির হাদীছ ও ইজ্‌মাা'এ উম্মাহ্‌র আলোকে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে গ্রহণ-বর্জন করতে হবে। অবশ্য বিশেষজ্ঞ নয় এমন সাধারণ মানুষের জন্য গৌণ ও প্রায়োগিক ক্ষেত্রে বিশষজ্ঞদের মতামত মেনে নেয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই। তবে বিশেষজ্ঞ হিসেবে পরিচিত বা বিশেষজ্ঞ হবার দাবীদার ব্যক্তি সত্যি সত্যিই বিশেষজ্ঞ কিনা এবং বিশেষজ্ঞ হলেও আস্থা রাখার

মতো চরিত্রের অধিকারী কিনা তা বিচারবুদ্ধির আলোকে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখতে হবে।

অন্যদিকে বিশেষজ্ঞের জন্য কোনো বিষয়ে কেবল অন্যের মতামতের ভিত্তিতে অন্ধ মতামত পোষণ ও প্রদান গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। বরং তাঁর জন্য সে সব মতামতকে উপরোক্ত চার অকাট্য দলীলের মানদণ্ডে বিচার করে গ্রহণ-বর্জন অপরিহার্য। অন্যথায় তিনি আদৌ বিশেষজ্ঞ নন।

এছাড়া কোরআন মজীদের কোনো আয়াতের তাৎপর্য গ্রহণের ক্ষেত্রে বিতর্ক বা দ্বিমতের অবকাশ থাকলে কোরআন মজীদের অন্য আয়াত ও বিচারবুদ্ধির রায়ের সাথে সামঞ্জস্যশীল তাৎপর্য গ্রহণ করতে হবে। সমকালীন পরিস্থিতির স্বরূপ নির্ণয় এবং অকাট্য ইসলামী জ্ঞানসূত্র (কোরআন মজীদ) ও দ্বিতীয় স্তরের ইসলামী জ্ঞানসূত্রসমূহ বিশ্লেষণ করে সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার ক্ষেত্রে, বিশেষ করে সমকালীন জিজ্ঞাসাসমূহের জবাব উদ্ঘাটনে বিচারবুদ্ধির বিরাট ভূমিকা রয়েছে।

সহায়ক সূত্র ঃ

١. القرآن الكريم.

٢. مقدمه ای بر شناخت خدا: محمد محمدی ری شهری، انتشارات یاسر، تهران، ١٣۶۶ هـ.ش. (١٩٨٧م)

۳. در قلمروی شناخت: سید محمد محمودی، سروش، تهران، ۱۳۶۱ هـ.ش. (۱۹۸۲م)
٤. مسئلهء شناخت: استاد مرتضی مطهری، انتشارات صدرا، تهران، ۱۳۶۷ هـ.ش. (۱۹۸۸م)
٥. آموزش فلسفه: استاد محمد تقی مصباح یزدی، سازمان تبلیغات اسلامی، ۱۳۶۶ هـ.ش. (۱۹۸۷م)
۶. مبانی شناخت: محمد محمدی ری شهری، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، تهران، ۱۳۶۹ هـ.ش. (۱۹۹۰م)

AwliyaLink
- For the Seekers of Truth !!!
www.ahlulbaytbanglabooks.wordpress.com
E-mail: awliya1214@gmail.com